গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৯ বর্ষ ১১ সংখ্যা ২৭ অক্টোবর - ২ নভেম্বর ২০০৬ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ ভগৎ সিং জন্মশতবর্ষ পালন করুন

দেশবাসীর প্রতি কমরেড নীহার মুখার্জীর আহ্বান

এ'বছরটি হ'ল শহীদ-ই-আজম ভগৎ সিংয়ের জন্মশতবর্ষ। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। তিনি ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের এক অনন্য বিপ্লবী ও শহীদ। মাত্র ২৪ বছরের জীবনকালের মধ্যে তিনি বিপ্লবী চেতনা ও কর্মের এমন উচ্চস্তরে পৌঁছেছিলেন যা আমাদের বিস্মিত করে। বক্তব্য এবং কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তিনি দেশবাসীর জন্য যে বার্তা রেখে গিয়েছেন, তা আজও প্রাসঙ্গিক। ''বিপ্লব মানবজাতির জন্মগত অধিকার, স্বাধীনতা মানুষের আজন্ম অধিকার'' — তাঁর এই কথা দীর্ঘ একশো বছর অতিক্রম করে আজও প্রেরণা জোগায়।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অসংখ্য মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু একথা মানতে হবে যে, এই সংগ্রামের ছিল দু'টি পৃথক ধারা। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের প্রতি আপসমুখী মনোভাব নিয়ে গড়ে উঠেছিল একটি ধারা, যেটির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গান্ধীজি। অন্যটি ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে আপসহীন বিপ্লবী ধারা। ভগৎ সিং ছিলেন এই আপসহীন ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী প্রতিনিধি যিনি ছিলেন 'জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এমনকী ফাঁসিমঞ্চেও মাথা উঁচু করে প্রকৃত মানুষের মতো' চলার সুদৃঢ় লক্ষ্যে অবিচল।

আবেগের স্রোতে ভেসে চলা রোমান্টিক বিপ্লবী তিনি ছিলেন না; তিনি বস্তুবাদেরই চর্চা করেছেন, যুক্তিবাদ ছিল তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা। তাঁর বক্তৃতা এবং লেখায় যুক্তিবাদী চিন্তাধারা এবং

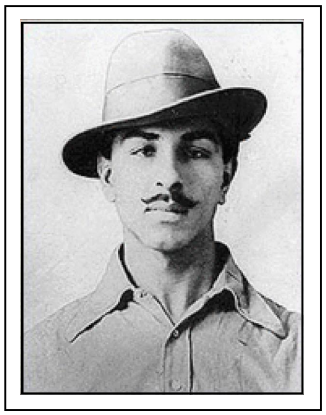

বৈজ্ঞানিক আদর্শবাদেরই সুস্পষ্ট প্রকাশ। অহিংস অসহযোগের গান্ধীবাদী নীতি সম্পর্কে মোহমুক্ত হয়ে ভারতের যে যুবশক্তি বিপ্লবী সংগ্রামের পথকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদের একমাত্র পথ বলে গ্রহণ করেছিল, ভগৎ সিং ছিলেন তাদের প্রতিনিধি। ব্যাপক গণজাগরণের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা খুব অল্প বয়সেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং তৎকালীন কিছু ভারতীয় নেতা ভগৎ সিং সহ অন্যান্য বিপ্লবীদের 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু জনগণের হৃদয়ে এই মহান বিপ্লবী 'শহীদ-এ-আজম' নামে শ্রদ্ধার স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। ভগৎ সিং হিংসার নীতির প্রতি অন্ধবিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন, ''বিপ্লবের অর্থ সশস্ত্র আন্দোলন হতেই হবে এমন নয়। কখনও কখনও বোমা-পিস্তল বিপ্লব সফল করার উপায়মাত্র হতে পারে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে কোন কোন আন্দোলনে বোমা এবং পিস্তল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু কেবলমাত্র এই কারণেই বোমা-পিস্তল এবং বিপ্লব সমার্থক হতে পারে না। বিদ্রোহকেও বিপ্লব বলা যায় না। যদিও বিদ্রোহ চূড়ান্ত পরিণামে বিপ্লবে পরিণত হতে পারে।''... ''পিস্তল এবং বোমাতেই বিপ্লব এসে যায় না, বরং যুক্তি বিচারের খরশানেই বিপ্লবের তলোয়ার ঝলসে ওঠে .... আমরা যে বিপ্লবের কথা বলি তার অর্থ পুঁজিবাদী শোষণ যন্ত্রণার অবসান ঘটানো।'' তাঁর বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে বোমা নিক্ষেপের মামলা চলাকালীন আদালতে দাঁড়িয়ে

পাঁচের পাতায় দেখুন

জনস্বার্থবিরোধী বলেই টাটার সঙ্গে চুক্তির শর্ত গোপন করছে সরকার

এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৯ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন, ''শিল্পায়নের দোহাই দিয়ে হাজার হাজার কৃষক ও খেতমজুরকে উচ্ছেদ করে রাজ্য সরকার টাটা ও সালিমদের হাতে কী কী শর্তে জমি তুলে দিচ্ছে সেটা ট্রেড সিক্রেটের নামে রাজ্যবাসীর কাছে গোপন করছে। এতেই পরিষ্কার যে, রাজ্য সরকার দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের এমন কিছু সুবিধে দিচ্ছে যার দ্বারা জনগণের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে। আসলে একদিকে কোষাগারে ঘাটতির অজুহাত দেখিয়ে সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক খাতে বরাদ্দ ব্যাপক ছাঁটাই করছে, অন্যদিকে একচেটিয়া পুঁজি ও মাল্টিন্যাশনালদের যথেচ্ছ মুনাফা লুণ্ঠনের সুযোগ দিতে কোটি কোটি টাকা ভর্তুকি দিচ্ছে। ক্ষমতায় বসে এই সব অগণতান্ত্রিক জনস্বার্থবিরোধী কাজ করবেন, একথা প্রকাশ্যে বলেই কি তাঁরা গত নির্বাচনে ভোট চেয়েছিলেন যে, মুখ্যমন্ত্রী দাবি করছেন জনগণের রায় তাঁদের পক্ষে তাই যা ইচ্ছে তাঁরা করতে পারেন? বরং গত ৯ অক্টোবর সরকার ও শাসকদলের প্রবল বাধানিষেধ উপেক্ষা করে জনগণ সাধারণ ধর্মঘটকে সফল করে সিঙ্গুর সহ রাজ্যের অন্যান্য স্থানের কৃষক ও খেতমজুরদের চাষের জমি থেকে উচ্ছেদের সরকারি পরিকল্পনার বিরুদ্ধেই রায় দিয়েছেন।''

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে আঘাত হেনেছে উত্তর কোরিয়া

''পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরীক্ষা সফলতার সঙ্গে করা হয়েছে'' — গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়ার ৮ অক্টোবরের এই ঘোষণাকে কেন্দ্র করে বুশ সরকার ও তথাকথিত বৃহৎ শক্তিগুলো যে আতঙ্ক তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে, তা নিতান্ত ভণ্ডামি ছাড়া কিছু নয়। উত্তর কোরিয়ার এই পারমাণবিক পরীক্ষাকে 'বিশ্বের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক' বলে অভিহিত করেছে মার্কিন কর্তারা।

কিন্তু বাস্তবে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন সরকার ও তার মিত্র জাপানই এই সঙ্কটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে এবং এই দুই শক্তিই এশিয়ার শান্তির প্রশ্নের প্রধান বিপদ।

গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়ার বিদেশ দপ্তর গত ৩ অক্টোবর এক বিবৃতি মারফৎ খোলাখুলি ঘোষণা করে দিয়েছিল যে, তারা এই ধরনের একটি পরীক্ষা করার দিকে যাচ্ছে। ঐ বিবৃতিতে একথাও বলা হয়েছিল যে, গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়ার সার্বভৌমত্ব ও অস্তিত্বের অধিকার নিয়েই বুশ সরকার গুরুতর হুমকি দেওয়ার ফলেই তারা পারমাণবিক পরীক্ষার রাস্তায় যেতে বাধ্য হচ্ছে। উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে অবরোধ জারির হুমকিকে ধিক্কার জানিয়ে ঐ বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, ''এই অবরোধের উদ্দেশ্য হচ্ছে, উত্তর কোরিয়াকে একঘরে করে দিয়ে তার শ্বাসরোধ করা এবং উত্তর কোরিয়ার জনগণ যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বেছে নিয়েছে, তাকে ধ্বংস করা।'' বিবৃতিতে আরও বলা হয় যে, ''আমেরিকার দিক থেকে আণবিক যুদ্ধের চরম হুমকি ও প্রবল চাপই উত্তর কোরিয়াকে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসাবে পারমাণবিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার আবশ্যিক প্রক্রিয়া অনুসরণে বাধ্য করেছে, যার অঙ্গ হচ্ছে পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ।'' কোরিয়ার জনগণের কাছে মার্কিন হুমকিটা অত্যন্ত বাস্তব। তাদের দেশকে আমেরিকাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দুভাগ করে দেয় এবং আজও দক্ষিণ কোরিয়ায় বিরাট সংখ্যায় মার্কিন সেনা মজুত রেখে সেই বিভাজন বজায় রেখে দিয়েছে। কয়েক

সাতের পাতায় দেখুন

উত্তর কোরিয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারির প্রতিবাদে ১৭ অক্টোবর কলকাতায় এস ইউ সি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে এক বিক্ষোভ মিছিল মার্কিন প্রচার দপ্তরের সামনে যায়, সেখানে জর্জ বুশ-এর কুশপুতুল পোড়ানো হয় এবং তার উদ্দেশে একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়

আরব সাগরের মিঠে পানি ঃ কুসংস্কার আজও কত গভীরে

অন্য সব সাগরের মতোই আরব সাগরের জলও লবণাক্ত। কিন্তু এই কিছুদিন আগে বাণিজ্য রাজধানী শহর মুম্বাইয়ের মহল্লায় মহল্লায় হঠাৎ এক বার্তা রটে গেল ক্রমে— সেই আরব সাগরের জলই নাকি আর নোনতা নেই ! কেন— কী ব্যাপার ? কীভাবে এটা ঘটল ? না, এভাবে এই ভাষায় সেখানকার অধিকাংশ মানুষ প্রশ্ন করেননি। কারণ, আমাদের দেশের জীবননাট্যের ডায়ালগগুলো যে এইরকম করে লেখাই হয়নি ! তাঁরা প্রশ্ন করেছেন, এই ঘটনা কে ঘটাল ? কার জন্য এমন উল্টো কাণ্ড ঘটল ?

স্বভাবতই, প্রশ্নটা এইভাবে উত্থাপন করলে লোকে আর ঘটনাকে ঘটনা ভাবে না, প্রাকৃতিক ঘটনা বলে মনে করে না। তখন তারা এরকম কাণ্ডকে ভাবে অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা। ঐশ্বরিক আশ্চর্য। দৈব মহিমা। আর তখন তারা কারণ নয়, কারক খোঁজে। যেমন, আদিম যুগের মানুষ খুঁজত। কারকও কারণ। কিন্তু সে তখন একরকম চেতন সত্তা, ঐচ্ছিক শক্তি, ঐশী মহিমা। তখন আরব সাগরের জল কার মহিমায় আলুনি হয়ে গেল বা হতে পারল— এটাই তারা খোঁজে। আর এর উত্তর তো ভারতবর্ষে পাওয়া খুব সহজ — এক এবং একাধিক। কেউ কেউ সরাসরি জগতের স্রষ্টা ধর্তা সংহর্তা জগদীশ্বরকেই কারক বলতে বা ভাবতে পারে। আবার কেউ কেউ স্থানীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী শিব, দুর্গা, গণেশ, ভেঙ্কটেশ, আই-আপ্পা ইত্যাদি ঈশ্বরের অধস্তন প্রতিনিধিদের কথাও ভাবতে পারে। নতুবা, কোনও আধুনিক আধ্যাত্মিক-মাহাত্ম্য ধারণ ও বিতরণকারী সাধুবাবা কিংবা সাধ্বী মা-র কথা মনে পড়তে পারে।

আর এই তিনটি বিকল্পের যে কোনওটি মাথায় ধাক্কা দিলেই ভারতবর্ষের বেশির ভাগ মানুষ সাধারণত যা করে, এক্ষেত্রে মুম্বাই শহরের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অসংখ্য অবদান-অলঙ্কারে সজ্জিত নাগরিকরাও তার কোনও ব্যত্যয় ঘটতে দেননি। দলে দলে শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে ছুটে গেছেন আরব সাগরের তরঙ্গমালার ধারে। পাত্রে করে তুলে নিয়েছেন সেই কল্পিত মহিমান্বিত জল— তুলে দিয়েছেন প্রিয় কোনও রোগপীড়িত আপনজনের মুখে। এই আশায়, যে অলৌকিক হস্তাবলেপনে সাগরের নোনা জল মিঠে হয়ে যায়, তারই কৃপায় যদি রোগ সেরে যায় !

কার কার কী কী রোগ সেরেছে? জানা যায়নি। কিন্তু এটা জানা গেছে যে মুম্বাই শহরের অনেক বস্তিতেই আন্ত্রিক রোগ ছড়িয়েছে এবং তার অন্যতম বা আশু কারণ সাগরপানি পান।

আরও খবর আছে যে, আরব সাগর তার জলে আবার স্বস্বাদ ফিরে পেয়েছে। দ্বিধাগ্রস্ত বিলম্বে আসা পানি-প্রার্থীরা তাই এখন হতাশ।

যারা বস্তুজগতের যেকোন ঘটনার, এমনকী অস্বাভাবিক ঘটনারও জাগতিক ব্যাখ্যা খোঁজেন, কারণ দিয়ে কার্য বুঝতে চেষ্টা করেন, তাঁরা অবশ্য আরব সাগরের জলের স্বাদ বদলের রহস্যটা সহজেই ধরে ফেলেছেন। মহারাষ্ট্রের সাগর সমীপ জেলাগুলিতে এবং মুম্বাই শহরেও, গত জুলাই ও আগস্ট মাসে যে প্রবল বৃষ্টি হয়েছে তার জলধারাপাতেই সাগরের তীরবর্তী জলের লবণের ঘনত্ব খানিকটা কমে যায়। আর আরব সাগর অগভীর — মহারাষ্ট্রের কাছে অনেক দূর পর্যন্ত তার গভীরতা কম। ফলে সাময়িকভাবে বৃষ্টির জলের অনুপাত তাতে যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল। বৃষ্টির প্রস্থানের কিছু পরেই স্বাভাবিক ব্যাপনের নিয়মে সাগরের জল আবার নোনাজল হয়ে উঠেছে।

পুনশ্চ ঃ এইরকম ব্যাপার নাকি গত বছরও ঘটেছিল। তার আগেও নাকি ঘটেছে। এবং বর্ষাকালেই।

কিন্তু আমাদের কথা শুধু এটুকুই নয়। কোনও ঘটনা কেন ঘটে তা বোঝা এবং বোঝানোর মতো বুদ্ধিমান লোক এবং সক্রিয় সংগঠন আমাদের দেশে অনেক আছে। গণেশ মূর্তির দুধ খাওয়ার কীর্তি প্রচারের সময়ও আমরা ঘটনার দুটো পিঠই দেখতে পেয়েছিলাম। বহু নামকরা শিক্ষক-অধ্যাপক-বিচারপতি-পদস্থ আধিকারিক-ব্যবসায়ী ছুটছেন দুধের পাত্র হাতে কাছাকাছি কোনও গণেশ মূর্তিকে দুধ খাওয়াতে। আবার বহু অখ্যাত অজ্ঞাত যুক্তিবাদী ছাত্র-যুবক গ্লাস-চামচের সাহায্যে তরলের উপরের পৃষ্ঠটান তত্ত্বের দ্বারা বিষয়টাকে একটা প্রাকৃতিক ঘটনা হিসাবে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করছেন।

আসল কথা হল, এদেশের বেশিরভাগ মানুষ এই জাতীয় অলৌকিক ঘটনার সম্ভাবনায় বিশ্বাস করে। এটা না হলে ওটায়। না হলে আর একটায় ...। কেন ? অসুখ বিসুখ হলে তেলপড়া-জলপড়া-ঝাড়ফুঁক-মাদুলি-তাবিজ-চরণামৃত... আরও কত কিছুকে কাজে লাগায়। কেন ? সাপে বা কুকুরে কামড়ালে হাসপাতালে না গিয়ে ওঝাকে ডাকে। কেন ? গ্রামে দুটো ছাগল বা গরু মরে গেলে কাউকে (সাধারণত অনাথা গরিব বৃদ্ধাকে) ডাইনি নাম দিয়ে মারধোর করে বা মেরে ফেলে। কেন ? বৃষ্টির আশায় সিপিএম মন্ত্রী ও পঞ্চায়েত প্রধানের তত্ত্বাবধানে ব্যাঙের বিয়ে দেয়। কেন ?

এই সমস্ত 'কেন'-র উত্তর জানা দরকার। তার জন্য আমাদের দু-জায়গায় ধর্না দিতে হবে। প্রথমত ইতিহাসের কাছে। দ্বিতীয়ত দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কাছে।

ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাব— আমাদের দেশে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা থেকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাপ্রাপ্তি ও অর্জনের তাগিদে যে রেনেসাঁস আন্দোলন শুরু হয়েছিল রামমোহন-বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায়, তা কিছুদূর পর্যন্ত সঠিক দিশায় এগোনোর পরই এক পুনর্পশ্চাদমুখী জাতীয় সাংস্কৃতিক-মনস্তাত্ত্বিক গোলকধাঁধাঁয় পথ হারাতে থাকে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বঙ্কিমচন্দ্র-দয়ানন্দ প্রমুখের প্রভাব ও প্রচারে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় আদর্শ-মূল্যবোধ ও চিন্তাপদ্ধতি গৌরবান্বিত হয়ে উঠতে থাকে। আধুনিক জীবনবোধ ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারা পশ্চিমের ভ্রান্ত পথ বা ভারতীয় ঐতিহ্যের উপর আঘাত হিসাবে চিহ্নিত হতে থাকে।

কিন্তু কেন ?

এবার আমাদের যেতে হবে আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণে। এযুগের মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক, আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা, শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছিলেন, ভারতবর্ষের বুর্জোয়াশ্রেণী তার জন্মলগ্ন থেকেই ছিল দুর্বল, আপসমুখী, সংগ্রামবিমুখ। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের সঙ্গেও সে যেমন আপস করে দরকষাকষি করে নিজের স্বার্থ হাসিল করতে চেয়েছে, সামন্ততন্ত্রের সঙ্গেও সে আপস ও বোঝাপড়া করেই এগোতে চেষ্টা করেছে। ফলে রেনেসাঁস থেকে শুরু করে স্বাধীনতা আন্দোলনে সেই শক্তিকেই সে নেতৃত্বে রাখতে চেয়েছে যারা রাজনীতির মঞ্চেও যেমন আপসপন্থী, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তেমনই পশ্চাৎপন্থী। এরই ফলে ধর্মের সাথে আপস, জাতিভেদের সাথে আপস, সাম্প্রদায়িক বিভেদের সঙ্গে আপস, কুসংস্কারের সঙ্গে আপস। এই প্রক্রিয়ায় আমাদের দেশবাসীর মনে যে জাতীয় সমাজ-মনস্তত্ত্ব গড়ে উঠল তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে থেকে গেল এইসব বিজ্ঞানবিরোধী অযৌক্তিক রক্ষণশীল নানা ভাবনা ধারণা ও চিন্তাপ্রক্রিয়া। শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে। ফলে হিমালয়ের পাদদেশে, আরব সাগরের কোলে, করমণ্ডল উপকূলে কিংবা মালভূমি-সমভূমির আনাচে-কানাচে— সর্বত্রই গণেশ দুধ খায়। সাপে কামড়ালে ওঝা ডাকা হয়। 'ডাইনি' হত্যা হয়। বৃষ্টির জন্য যজ্ঞ করা হয়। ইসরোর বিজ্ঞানীরা রকেট বা মিসাইল পরীক্ষার আগে বালাজির মন্দিরে হত্যে দেন। নির্বাচিত হলে রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী তিরুপতি মন্দিরে চুল কেটে ন্যাড়া হয়ে আসেন। সরকারি সব কাজই হয় পাঁজিপুঁথি দেখে। ইত্যাদি ...

আরও একটা কথা আছে।

সচ্ছল পরিবারের কথা থাক। বিপদে-আপদে অসুখ-বিসুখে গরিব মানুষেরা যাবে কোথায় ? কার কাছে যাবে ? বিজ্ঞান মেনেই বা তাদের কী সুবিধা ? সাপে কামড়ালেই বা সে গ্রামে হাসপাতাল পাবে কোথায় ? যেখানে হাসপাতাল আছে সেখানেই বা ওষুধ কোথায় ? কঠিন ব্যাধিতে পড়লে তাদের জন্য কোথাও সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত নেই। তারা যেখানে যেতে পারে, সেখানে ডাক্তার-নার্স-ওষুধ-পথ্য নেই। ডাক্তার-নার্স-ওষুধ-পথ্য যেখানে আছে সেখানে তাদের সামর্থ নেই যাওয়ার। এই অবস্থায় যদি কেউ তাদের বলে, 'তারকেশ্বরে গিয়ে হত্যে দাও', 'দুধপুকুরের পবিত্র জল খাওয়াও', 'ঘোষপাড়ার সতীমার মন্দিরে গিয়ে ডালিম গাছের ডালে কাপড়ের গিঁট বেঁধে এসো', কিংবা 'আরব সাগরের জল যখন মিঠে হবে, এক ঢোঁক খাইয়ে দাও'— তাদের বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না।

উন্নয়ন-শিল্পায়ন-ভারত উদয় কথাগুলো তারা হয়ত শুনেছে। কিন্তু জানে না, এগুলো ভাতে মাখে না গায়ে মাখে। আর অন্যদিকে যে বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপস করেই ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়েছে, তারা কিন্তু শ্রমিক-কৃষক ও আপামর জনসাধারণকে শোষণ করে নিজেদের মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কোনও আপস করেনি বা দুর্বলতা দেখায়নি। ফলে দশ-পনেরো কোটি লোকের জীবনে যাই উন্নয়ন এসে থাকুক, বাকি নব্বই কোটির জীবনে শুধুই দুর্দশার কালোছায়া। মানব উন্নয়ন সূচকের মাপকাঠিতে মানের অধঃক্রমে সারা বিশ্বের মধ্যে ১৩৯ নম্বর স্থানাধিকারে গর্বিত দেশের নাগরিক তারা। যাকে আমরা বুদ্ধিমান লোকেরা বলছি কুসংস্কার, অলৌকিকতায় ভ্রান্ত বিশ্বাস, নিরুপায় মানুষের কাছে সেটাই বাঁচার আশ্রয় খোঁজার সমান। ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো ধরার মতো। তাই প্রায় আট দশক আগে যে কথাটা নজরুল লিখেছিলেন— ''মেনে শত বাধা টিকিটিকি হাঁচি/ টিকি দাড়ি নিয়ে আজও বেঁচে আছি''— দেশের অবস্থা তার থেকে খুব একটা পাল্টায়নি।

সুন্দরবন রক্ষার শপথ

গত ২১ আগস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোসাবার লাহিড়িপুরে 'সুন্দরবন সংস্কৃতি চক্র'-এর উদ্যোগে সুন্দরবন দিবস পালিত হয়। প্রচণ্ড দুর্যোগের মধ্যেও প্রবল উৎসাহের সাথে এই অনুষ্ঠানে রাত পর্যন্ত বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন শশাঙ্কশেখর মৃধা। প্রধান অতিথি ছিলেন নির্মল সরকার। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংস্কৃতি চক্রের সম্পাদক কানাইলাল সরকার। সুন্দরবনের উপর রচিত কবিতা ও বাউল সঙ্গীত পরিবেশন অনুষ্ঠানটিকে আকর্ষণীয় করে তোলে। বক্তারা বলেন, সুন্দরবনের বনভূমি রক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ সুন্দরবনের ৫৬ লক্ষ মানুষের জীবন। যে মানুষের জন্য বনভূমি রক্ষার প্রয়াস, সেই সুন্দরবনবাসী স্বাধীনতার ৬০ বছর পরেও আধুনিক জীবনের সমস্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এখানকার মানুষ এখনও পুকুরের জল পান করে। বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, সেচ, পরিবহন— কোনও পরিষেবা নেই। হাজার হাজার গরিব মানুষের বাঁচার একমাত্র অবলম্বন মাছ ধরা। তাও সরকার বন্ধ করে 'সাহারা'র কাছে সুন্দরবনকে লিজ দিচ্ছে। সুন্দরবনের গরিব ঘরের পুরুষেরা গ্রাম শূন্য করে পাড়ি দিচ্ছে কাজের খোঁজে আন্দামানে। মেয়েরা ছুটছে শহরে অন্যের বাড়িতে কাজ করতে। তাই সুন্দরবন বাঁচাতে রুখে দাঁড়াতে হবে সরকারের এই সর্বনাশা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে।

মুর্শিদাবাদে বন্যা-ভাঙন-মূল্যবৃদ্ধি-নারীপাচারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

বন্যা ও ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করা, বোরো চাষে কৃষকদের বিদ্যুৎ বিল মকুব, বিনা পয়সায় সার-বীজ সরবরাহ, জেলায় নারীপাচার-শিশুপাচার বন্ধ করা ইত্যাদি দশ দফা দাবি নিয়ে এস ইউ সি আই মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির উদ্যোগে ১৯ অক্টোবর জেলা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। খাগড়া চৌরাস্তা নেতাজী মূর্তির পাদদেশ থেকে দলের সহস্রাধিক কর্মী, সমর্থক, দরদি ও সাধারণ মানুষের সুসজ্জিত মিছিল বহরমপুর শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে জেলাশাসক দপ্তরে পৌঁছায়। জেলা সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষাল, উত্তর কোরিয়ার পরমাণু পরীক্ষার সমর্থনে এবং তার উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানোর প্রতিবাদে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর বিবৃতি পাঠ করে শোনান এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও সাম্প্রতিক উত্তর কোরিয়ার ওপর আমেরিকা ও তার দোসরদের ঘোষিত অর্থনৈতিক অবরোধের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন যে, রমজান মাস বলে সাম্রাজ্যবাদ কাউকে রেহাই দেয়নি। ইরাক আজও লড়াইয়ের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

জেলাশাসকের উদ্দেশে প্রেরিত দশদফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপিটি পাঠ করে শোনান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কমরেড আব্দুস সালাম। গত ১৪ অক্টোবর জেলাশাসককে আগাম চিঠি দিয়ে সময় চাওয়া সত্ত্বেও বিক্ষোভ ডেপুটেশনের দিন নিজে আলোচনার জন্য উপস্থিত না থাকায় সমাবেশের পক্ষ থেকে ধিক্কার জানানো হয়। অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) স্মারকলিপি গ্রহণ করেন।

ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি প্রসঙ্গে

পরমাণু শক্তি সংক্রান্ত ভারত-মার্কিন সাম্প্রতিক চুক্তিটি শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সারা বিশ্বেই গুরুতর পর্যালোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। এদেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সামরিক ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে এই চুক্তির ফলাফল কী হতে পারে তা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। এদেশের শক্তির চাহিদা ও যোগানের নিরিখেও এ চুক্তির ঘোষিত উদ্দেশ্য কতটা বাস্তব তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। আশা ও আশঙ্কার দ্বন্দ্বে আলোড়িত বর্ষীয়ান বিজ্ঞানীরাও শেষ পর্যন্ত সরকারের আসন্ন চুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। পারমাণবিক ক্ষেত্রে গবেষণা ও পরিকাঠামোগত অগ্রগতিতে দায়িত্বশীল বিজ্ঞানীদের সাথে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর বৈঠক ঘটনার গুরুত্বকেই সূচিত করে। অবশ্য আলোচনার শেষে বিজ্ঞানী মহল সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে পরিস্থিতিকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে সাড়া দিয়েছেন বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

চুক্তিটির অরিজিন্যাল গুণপনায় কোন ভেজাল কলঙ্কজনক শর্ত ঢুকেছে কি না তা নিয়ে সিপিআই সিপিএমের মত দলগুলি লড়াই-এ খুব ঝাঁপিয়েছে, পরে হাঁপিয়ে থেমে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর লোকসভায় বিবৃতিদানের পর তারা খুশি হয়ে বলেছে — সব কুছ ঠিক্ হ্যায়। তাদের তোলা ৯ দফা প্রশ্নের ১০ দফা উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে সমর্থন করেছে চুক্তিকে। বিজেপিও একই প্রশ্ন তুলে শেষ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছে।

বলাবাহুল্য চুক্তিটি এখনও প্রস্তাবিত। আমেরিকায় আরও দু'টি পর্বে আলোচনা বাকি আছে। এর একটি হ'ল পরমাণু জ্বালানি সরবরাহকারী চুক্তিতে পরস্পর আবদ্ধ দেশগুলির অনুমোদন। প্রধানমন্ত্রী বিবৃতিতে বলেছেন ২০০৫ সালের ১৮ জুলাই দু'দেশের মধ্যে যে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে খসড়া তৈরি হয়েছে তার বাইরে কোন শর্ত থাকলে তা মানা হবে না। সার্বভৌমত্ব, স্বাধীন পরমাণু নীতি, বাণিজ্যনীতি, পরমাণু গবেষণা বিষয়ে কোনও চাপ মানা হবে না।

সরকারি তরফে চুক্তি সম্পর্কে যা জানানো হয়েছে, তার মূল কথা হ'ল অসামরিক ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ তৈরির জন্য পরমাণু জ্বালানি ও চুল্লি আমেরিকা দেবে। এজন্য অসামরিক ও সামরিক প্রয়োজনের চুল্লি ভাগ করে চিহ্নিত করতে হবে। অসামরিক ক্ষেত্রের চুল্লির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরমাণু তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থার (আই এ ই এ) তত্ত্বাবধান থাকবে। এরকম চুল্লি ১৪টা। চুক্তির দরুন জ্বালানির অভাব হবে না। পরমাণু বোমা তৈরির চুল্লিগুলোর ওপর কোন নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নই ওঠে না। চুক্তির উদ্দেশ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানো, তাই ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ পুনঃশোধন ও ভারি জল প্রযুক্তির চুল্লির প্রযুক্তি আমেরিকা দেবে না। কারণ তা সংবেদনশীল পরমাণু প্রযুক্তি (SNT) যা পরমাণু বোমা তৈরির কাজে লাগে।

সরকারি সূত্রে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক পরমাণু চুক্তি ভারতের বিদ্যুৎ শক্তির ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখবে। প্ল্যানিং কমিশনের মতে, ২০১৪ সালে বিদ্যুৎ দরকার হবে ৮ লক্ষ মেগাওয়াট আর এখন উৎপাদন ক্ষমতা ১ লক্ষ ৩১ হাজার মেগাওয়াট। প্রধানমন্ত্রী একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন উপলক্ষ্যে একথা জানান। সুতরাং পরমাণু বিদ্যুৎ চাই। যদিও তেল, গ্যাস, কয়লা, জলবিদ্যুৎ, সৌরবিদ্যুৎ, বায়োগ্যাস প্রভৃতি সমস্ত সম্ভাবনাকেই কাজে লাগানো হবে বলে বলা হচ্ছে।

যাই হোক, বলা হয়েছে ভারত চুক্তির জন্য কোথাও পিছু হটেনি, আপস করেনি। শান্তির নীতি থেকেও বিচ্যুত হয়নি। বরং আমেরিকাকেই তার সাবেক অবস্থান থেকে সরে আসতে হচ্ছে। 'ব্যতিক্রমী' সুবিধা দেওয়ার জন্য তাদের ১৯৫৪ সালের পরমাণু শক্তি আইনের ১২৩ নং ধারাটি সংশোধন করতে হচ্ছে। আমেরিকার হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভের সভায় 'ইউ-এস-ইণ্ডিয়া কো-অপারেশন অ্যাক্ট ২০০৬' যে বিপুল ভোটে পাশ হল, তা শুধু বুশের নীতির জয়কেই দেখাচ্ছে না, ভারতীয় নীতির সাফল্যকেও সূচিত করছে। ভারত পরমাণু অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তিতে (NPT) সই না করেও পরমাণু অস্ত্র রেখেছে। সিটিবিটি-তেও (কমপ্রিহেনসিভ টেস্ট ব্যান ট্রিটি) ভারত সই করেনি। তা সত্ত্বেও এই সুযোগ কম কৃতিত্বের নয়। তাছাড়া ১৯৭৪-এ পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষা চালানোর পর থেকে আমেরিকা পরমাণু প্রযুক্তি ও জ্বালানি সরবরাহের ওপর যে নিয়ন্ত্রণ এতদিন চাপিয়ে রেখেছিল সেটাও প্রত্যাহৃত হচ্ছে। সুতরাং জয় তো সবদিক থেকেই !

আরও কথা আছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতবর্ষ ৩০ হাজার মেগাওয়াট পরমাণু বিদ্যুৎ তৈরি করবে। এ কি চাট্টিখানি কথা। ভারতের উন্নয়ন ও বিশ্ব শান্তির পক্ষে সাম্প্রতিক চুক্তি তো ভালই। বিদ্যুতের যোগানে ৭০-৭১ শতাংশ নির্ভর করতে হয় তেলের উপর। তেলের যোগান আবার নির্ভর করে তেল আমদানির উপর। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই পরমাণু শক্তি তেল নির্ভরতা কমাবে। পক্ষান্তরে আমদানি নির্ভরতাও কমবে যা অনুক্ত। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, তাহলে তেলক্ষেত্রের বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে কেন? সরকারি বক্তব্য হল আমদানি নির্ভরতা কমানো ছাড়াও উপরি পাওনা আছে। সামরিক ও অসামরিক পারমাণবিক চুল্লির বিভাজনটি সব পরমাণু শক্তিধর দেশগুলি মেনে নিচ্ছে। এর গুরুত্ব অপরিসীম।

সংবাদে প্রকাশ, আমেরিকায় প্রতিনিধি সভায় চুক্তি নিয়ে তিনটি সংশোধনী আনা হয়েছিল। এক) ভারতকে পরমাণু অস্ত্র তৈরির প্রয়োজনীয় উপাদান উৎপাদন বন্ধ করতে হবে, দুই) ইউরেনিয়াম কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার রিপোর্ট দিতে হবে প্রতিবছর, তিন) ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ন্ত্রণে আমেরিকাকে সাহায্য করতে হবে।

এই তিনটি সংশোধনীই বাতিল হয়েছে প্রতিনিধি সভায়। অবশ্য সংশয় তাতেও অনেকের মধ্যে কাটেনি।

এনার্জি (শক্তি) সমস্যা ও সরকারি বক্তব্য

যখন তারাপুর পরমাণু চুল্লিটি বেশ সমস্যায় পড়েছিল তখন ঘোষণা করা হয়েছিল ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট পরমাণু শক্তি উৎপাদন করা হবে। এটা কি সম্ভব? এস কে জৈন চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অব নিউক্লিয়ার পাওয়ার করপোরেশন এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম সরবরাহ এদেশে কম হলেও এটা 'দিবা স্বপ্ন' নয়। রাশিয়া কুণ্ডলকুলমে দু'টি পরমাণু চুল্লিতে এখন জ্বালানি সরবরাহ করে থাকে। সেখানে আরও ৬টি ইউনিট খোলার মত জায়গা ও সুযোগ আছে। জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। আমরা চাই একটা এলাকায় একটা ক্ষেত্রে একই ধরনের প্রজেক্ট বা আয়োজন যাতে এগুলির মধ্যে একটা সমন্বয় ও পরিপূরক সাহায্য বিনিময়ের ভিত্তিতে কাজ করা যায়। এটা হলে ব্যবস্থাটা লাভজনকও হবে। এখানে আরও ৪টিতে জ্বালানি দেবে রাশিয়া। আমরা তিন-চারটি ক্ষেত্রে আরও ব্যবস্থা করেছি। একটা ফ্রান্সের জন্য, একটা রাশিয়ার জন্য, একটা আমেরিকার জন্য। পারমাণবিক শক্তির এগুলিই হবে মূল সরবরাহ কেন্দ্র। এরপর জাপানের কথাও ভাবছি। তিনি বলেন ভারত ও চীন উন্নয়নের পথে যেভাবে এগোচ্ছে তাতে এরাই শক্তির এক বৃহৎ বাজার অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ ক্রেতা হয়ে উঠছে। সুতরাং পারমাণবিক শক্তির বড় অংশ তাদের প্রয়োজন। সব চাহিদা যদি ফসিল অয়েল থেকে মেটাতে হয় তবে তার দাম নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও এদের কব্জায় চলে আসবে! কী করে তা হবে অবশ্য উনি তা বলেননি। তাঁর দাবি এই বিরাট চাহিদা অর্থাৎ বিরাট বাজারকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা কারুর নেই—এমনকী আমেরিকারও নেই। তিনি আরও বলেন যে ন্যাশন্যাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশনও যদি উদ্যোগ নেয় তাহলেও আমরা সমর্থন করব। [ফ্রন্টলাইন ১৬-৬-০৬]

তাছাড়া হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন না তারা। মেঘালয়ে যে ইউরেনিয়াম উৎস আছে, স্থানীয় সরকারের ও জনগণের আপত্তির বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করে কেন্দ্রীয় সরকার এগোবে ইউরেনিয়াম নিষ্কাশনের জন্য। [ঐ]

এই তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে ঃ এক) ভারতের পরমাণু চুল্লি ক্রমাগত বাড়ানো ও ইউরেনিয়াম জ্বালানি আমদানির প্রশ্নে ভারত সরকার আমেরিকার সঙ্গে সাম্প্রতিক চুক্তি ছাড়াও রাশিয়া, ফ্রান্স এমনকী জাপানকেও তার পরিকল্পনার অঙ্গ করেছে; দুই) একই সঙ্গে ভারতের উৎসগুলি থেকে ইউরেনিয়াম নিষ্কাশনের পরিকল্পনাও তার আছে; তিন) বিশেষত রাশিয়া এই প্রজেক্টে ইতিমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত।

এনার্জি সমস্যা ও সরকারি যুক্তির সারবত্তা কতটা

পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া জনজীবনে কী মারাত্মক হতে পারে, সেই প্রশ্নে বর্তমান আলোচনায় আমরা যাচ্ছি না। এবার দেখা যাক প্রস্তাবিত চুক্তির ফলে পরমাণু বিদ্যুৎ কতটুকু বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে পারে। অসামরিক ১৪টি চুল্লি থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ বর্তমানে ব্যবহৃত (consumed) বিদ্যুতের মাত্র চার শতাংশ। ২০১৪ সালের মধ্যে এগুলি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে যাবে। [সূত্র ঃ দি স্টেটসম্যান, ২৭-৮-০৬]

প্ল্যানিং কমিশনের হিসাব থেকে দেখা যায়, চাহিদার ২-৩% মিটবে ২০১৫ সালে পরমাণু বিদ্যুৎ থেকে আর ৪০-৪৫% মিটবে ফসিল উৎস মানে তেল, কয়লা, গ্যাস ইত্যাদি থেকে।

সুতরাং ২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রাটা দিবাস্বপ্ন কিনা বুঝতে অসুবিধা হয় কি? বিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্যান্য ধরনের সমস্ত ব্যবস্থার উৎপাদন ক্ষমতা যদি তখন পর্যন্ত স্থির থাকে, কোন অগ্রগতি না হয়, আর পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা যদি ১০০% বাড়ানো হয় তবে ঐ সময়ে পরমাণু চুল্লি থেকে এদেশে পাওয়া বিদ্যুৎ হবে সমগ্র বিদ্যুৎ উৎপাদনের মোট পরিমাণের মাত্র ৮ শতাংশ। [ঐ]

এখানে আর একটা প্রশ্নও এসে যায়। বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতার সবটা কাজে লাগানো হচ্ছে কি? সমস্ত উৎসগুলির ব্যবহারই বা কতটুকু হচ্ছে? ২০০৩ সালে ভারতের বিদ্যুৎ উৎপাদনের পূর্ণ ক্ষমতা ছিল ১০৭,৫৩৩.৩ মেগাওয়াট, যার মধ্যে ৭১ শতাংশই তেলগ্যাস নির্ভর। আমাদের জলবিদ্যুৎ উৎপাদন মূলত উত্তর ও উত্তর-পূর্ব এলাকায় হয়, তার পূর্ণক্ষমতা ১,৫০,০০০ মেগাওয়াট কিন্তু তা থেকে উৎপাদন করা হয়েছে মাত্র ২৬,৯১০ মেগাওয়াট (পূর্ণ ক্ষমতার প্রায় ১৮ শতাংশ) [সূত্র ঃ পূর্বোক্ত]

সুতরাং পরমাণু জ্বালানি দিয়ে বিদ্যুৎ সমস্যার নামমাত্র সমাধান হবে; আবার ইতিমধ্যে মজুত শক্তির সম্ভাবনা ব্যবহারও করা হচ্ছে না। কয়লা, তেল, গ্যাস ইত্যাদির নির্ভরতাই বা কমছে

চারের পাতায় দেখুন

ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে ডেপুটেশন

মহেশতলা

এস ইউ সি আই মহেশতলা আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে ১৯ অক্টোবর কমরেডস্ শচীনন্দন মিত্র, ফজলুল পিয়াদা, রবীন দাস, সাকিলা বিবি এবং নূরজাহান বেগম প্রমুখ পাঁচ জনের এক প্রতিনিধি দল পুরসভার সমস্ত ওয়ার্ডে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের জন্য চেয়ারম্যানের কাছে চার দফা দাবি সনদ পেশ করেন এবং জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানান। একজন ডেঙ্গু আক্রান্ত ও একজন ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীর তথ্যও পেশ করা হয়। চেয়ারম্যান মহেশতলার জলনিকাশি ব্যবস্থার বেহাল দশা স্বীকার করে নিয়ে বলেন যে, ১৬ অক্টোবর থেকে প্রতিটি ওয়ার্ডে তারা ব্লিচিং পাউডার ছড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন এবং দশদিন অন্তর যাতে মশা-মারার তেল স্প্রে করা হয় তারও ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

খিদিরপুর-তারাতলা

৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯ ও ৮০ প্রভৃতি ওয়ার্ডগুলিতে জমা জঞ্জাল পরিষ্কার না হওয়ায় যে নিদারুণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রতিকারের দাবি নিয়ে এস ইউ সি আই খিদিরপুর-তারালতা আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে ১৮ অক্টোবর ৯নং বরো চেয়ারম্যানের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। দাবি লেখা প্ল্যাকার্ডসহ একটি মিছিল এলাকা পরিক্রমা করে বরো অফিসে যায়। কর্তৃপক্ষ দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া বা অন্যান্য রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেওয়ার ও আক্রান্তদের চিকিৎসার প্রতিশ্রুতি দেন।

বেহালা

১৮ অক্টোবর কলকাতা পুরসভার অ্যাডেড এরিয়া বেহালায় ১৩নং ও ১৪নং বরোর চেয়ারপারসন ও চেয়ারম্যানের কাছে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে এস ইউ সি আই বেহালা (পূর্ব), বেহালা (পশ্চিম) ও বড়িশা-সরশুনা আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে কলকাতা জেলা কমিটির সদস্যা কমরেড অমিতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে ৬ জনের এক প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন দেয়। তার আগে দলীয় কর্মী-সমর্থকরা মিছিল করেন। এই দু'টি রোগ অধ্যুষিত ওয়ার্ডগুলিতে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে বর্ষার জমা জল দ্রুত অপসারণ, সমস্ত ওয়ার্ডে নিকাশির উন্নয়ন, মশা নিধনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, বিদ্যাসাগর হাসপাতাল ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র-গুলিতে ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া নির্ণয়ের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দাবিসনদ পেশ করে পুর কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হয়।

গার্ডেনরিচ

কলকাতায় ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, চিকুনগুনিয়া প্রভৃতি মশাবাহিত মারণ রোগ প্রতিরোধে গত ১৮ অক্টোবর এস ইউ সি আই গার্ডেনরিচ আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে ১৫নং বরো চেয়ারম্যানকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়, ১) প্রতিদিন ভ্যাটগুলো থেকে জঞ্জাল অপসারণ সহ নর্দমা পরিষ্কার ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার সংস্কার অবিলম্বে শুরু করতে হবে।

২) রোগাক্রান্তদের অবিলম্বে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩) রোগ সংক্রমণ আটকাতে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধক ব্যবস্থা নিতে হবে।

ডেপুটেশনে লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড দীপু গুপ্তের নেতৃত্বে এলাকার এস ইউ সি আই কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

আড়ষায় ওয়েজ ইন্সপেক্টরকে ঘেরাও করল বিড়ি শ্রমিকরা

গত ১৩ অক্টোবর আড়ষা বিডিও অফিসে পুরুলিয়া জেলা বিড়ি শ্রমিক সংঘের উদ্যোগে শতাধিক বিড়ি শ্রমিক ওয়েজ ইন্সপেক্টরকে দু-ঘন্টা ঘেরাও করে। সমস্ত বিড়ি শ্রমিককে পরিচয়পত্র প্রদান, দুর্নীতি বন্ধ করে পি এফ চালু করা, ন্যায্য মজুরি, স্থায়ী কাজ ও স্থায়ী হাসপাতাল তৈরি এবং সন্তানদের পড়াশুনার সুষ্ঠু ব্যবস্থার দাবিতে বিড়ি শ্রমিকরা ডেপুটেশন দিতে বিডিও অফিসে উপস্থিত হলে জানা যায়, আগে জানানো সত্ত্বেও বিডিও অনুপস্থিত। বিডিও'র অনুপস্থিতিতে শ্রমিকরা ওয়েজ ইন্সপেক্টরকে ডেপুটেশন দেয়। কিন্তু তিনি দাবিপূরণের কোন আশ্বাস না দিয়ে পরিচয়পত্র প্রদানের ব্যাপারে নানা অজুহাত দেখাতে থাকলে উপস্থিত বিড়ি শ্রমিকরা তাঁকে ঘেরাও করে। অবশেষে ১৯ অক্টোবর এলাকায় গিয়ে শ্রমিকদের পরিচয়পত্র প্রদান ও অন্যান্য সমস্যাগুলি খুঁটিয়ে দেখার আশ্বাস দিলে ঘেরাও তুলে নেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের আড়ষা আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমরেড অনাদি কুমার, জেলা কোষাধ্যক্ষ কমরেড মধুমিতা মাহাত ও জেলা সম্পাদক কমরেড রঙ্গলাল কুমার। কর্মসূচিতে নারী শ্রমিকদের উপস্থিতি ও ভূমিকা ছিল লক্ষণীয়।

পিচরাস্তা তৈরির দাবিতে বাগনানে বিশাল গণডেপুটেশন

বাগনান থেকে হেতমপুর, রাস্তি, নজরপুর, বাগাবেড়িয়া, বলরামপুর ও কাজিভূএেওয়া হয়ে কাঁটাপুকুর পর্যন্ত রাস্তাটিকে পিচরাস্তায় পরিণত করার দাবিতে ১১ অক্টোবর বাগনান ২নং বিডিও অফিসে এবং ১২ অক্টোবর বাগনান ১নং বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী, মহিলা-পুরুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সহ প্রায় এক হাজার মানুষ এই গণডেপুটেশনে সামিল হন।

উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সালে রাস্তাটির কাজ শুরু হয়। স্থানীয় মানুষ নিঃশর্তে রাস্তার দু'ধারের ব্যক্তিগত জমি সামাজিক স্বার্থে দান করেন। তখনই রাস্তাটি পিচ করার কথা ছিল। কিন্তু পিচরাস্তার পরিবর্তে রাস্তাটিকে ইঁটের রাস্তায় পরিণত করা হয়। তারপর প্রায় ৩০-৩২ বছর কেটে গেছে কিন্তু রাস্তায় আর কোন কাজ হয়নি। একের পর এক ভোট এসেছে, প্রতিবারই শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীরা আশ্বাস দিয়ে গেছেন যে ভোটের পরেই পিচরাস্তা হবে। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয়নি।

বর্তমানে রাস্তাটির এমনই বেহাল অবস্থা যে, চলতে গিয়ে ঠোক্কর খেয়ে পড়ে গিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটেছে। হাত-পা ভাঙা তো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু প্রশাসন নির্বিকার। অনেক আবেদন নিবেদনেও কাজ না হওয়ায় স্থানীয় মানুষ সংগঠিত হয়ে প্রথমে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে এবং পরে এক গণকনভেনশনের মধ্য দিয়ে 'রাস্তা উন্নয়ন কমিটি' গঠন করে।

যেহেতু রাস্তাটি দু'টি ব্লকের এলাকাধীন সেই জন্য কমিটির নেতৃত্বে দু'টি ব্লকের বিডিওর নিকটই ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয়। আন্দোলনের চাপে উভয় ব্লকের বিডিওই যত শীঘ্র সম্ভব রাস্তাটিকে পিচ রাস্তায় পরিণত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দাবি পূরণ না হলে আন্দোলন আরও তীব্র করা হবে বলে কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি প্রসঙ্গে

তিনের পাতার পর

কোথায়?

তাই বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে পরমাণু চুল্লিকে ত্রাতা হিসাবে দেখানো বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে ভূয়ো দাবি। অন্যদিকটাও দেখা যাক। ইউরেনিয়ামের অভাব? কতটা অভাব? এই অভাব মেটানোর উপায় কি ঐ চুক্তি ছাড়া ছিল না? এর উত্তরে বলতে হয় ৯,৫০০ টন ইউরেনিয়াম ধাতুর ভাণ্ডার এদেশে আছে যা থেকে নিষ্কাশিত হতে পারে ৬,৯০০ টন ইউরেনিয়াম যা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। [সূত্র ঐ]

প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে যে, ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাক্টর নিয়ে যে হৈ চৈ হচ্ছে (এবং ভারত সরকার এগুলি আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে আনবে না) তার কারণ এই কারিগরিতে খায় যতটা, দেয় তার বেশি — ফাস্ট ব্রিডার পরমাণু চুল্লির জ্বালানিতে যতটা স্বতঃভঙ্গুর তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকে পোড়ার পর ছাইতে থাকে তার চেয়ে বেশি। এক কিলো ইউরেনিয়াম সাধারণ চুল্লিতে পোড়ালে তার ছাইতে যে শক্তি নিহিত থাকে, ফাস্ট ব্রিডারে পোড়ালে তার একশোগুণ বেশি শক্তি পাওয়া যায়। [সূত্র ঃ পূর্বোক্ত]

এগুলিতে বিদ্যুৎ তৈরির প্রক্রিয়ার সবশেষে যে ছাই পাওয়া যায় তা পরমাণু বোমা তৈরির কাজে লাগে। এটুকুই আমাদের আলোচনায় যথেষ্ট। বিজ্ঞানের কারিগরি দিকগুলির আলোচনার আপাতত দরকার নেই।

যাইহোক, এটা অন্তত পরিষ্কার যে ইউরেনিয়াম সঙ্কটটাই এই চুক্তির চালিকাশক্তি বা মূল কারণ নয়। তাহলে প্রশ্ন, চুক্তিটা হচ্ছে কেন? কাদের স্বার্থে এই ব্যয়বহুল ব্যবস্থা জনগণের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে? তেল, গ্যাস, কয়লার বিদ্যুৎ তো অনেক সস্তা।

আন্তর্জাতিক স্তরে এনার্জি মার্কেটের ভাগাভাগির প্রেক্ষাপট

ভারত-আমেরিকার মধ্যে পরমাণু চুক্তির তাৎপর্য আলোচনা করতে হলে প্রথমে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া দরকার। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ভারতের জাতীয় পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্তর্নিহিত যে চাহিদা তারই রাজনৈতিক প্রকাশ ঘটেছে এই পরমাণু চুক্তিতে। আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব অর্থনীতির দ্বন্দ্ব সংঘাতের সঙ্গে, বিশ্ব অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের শরিক হিসাবে ভারতীয় অর্থনীতি-রাজনীতির বিচিত্র সংঘাত ও সমঝোতার বর্ণময় এক বিধ্বংসী অস্ত্র হিসাবে চুক্তিটি কোটি কোটি শোষিত জনতার বুকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এবার দুনিয়াটা একটু দেখা যাক।

এক) রাশিয়া-চীন-ইরান সম্পর্ক ঃ পশ্চিম এশিয়ার তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার ইরান এতদঅঞ্চলে মার্কিন-বৃটেনের শেষ শক্তিশালী বাধা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। ইরানের সঙ্গে রাশিয়া ও চীনের বিপুল বাণিজ্য সম্পর্ক রয়েছে। রাশিয়ার তেলের বড় অংশ শোধন হয় ইরানে। তেল-গ্যাস ক্ষেত্র ছাড়াও নানা প্রযুক্তিগত চুক্তিসহ ঠিকাদারি কাজে তারা এখানে লিপ্ত। এছাড়া রাশিয়া দুটো পরমাণু চুল্লি গড়ে দিয়েছে ইরানে। তাই ইরানের পরমাণু শক্তি গবেষণার বিরুদ্ধে আমেরিকা ও বৃটেন যেমন পদক্ষেপ চাইছে, চীন-রাশিয়া তেমন না চেয়ে আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা চাইছে।

সম্প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ফ্রান্স ও জার্মানিও তাই-ই চাইছে। অর্থাৎ ইরাকের ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছিল, তেমন ইরান প্রশ্নেও আমেরিকা প্রায় একাই। আই এ ই এ-র মতে ইরানের পরমাণু প্রযুক্তি বোমা তৈরির সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনেই পরমাণু প্রযুক্তি চলছে। আই এ ই এ-র অভিযোগ, তাদের রিপোর্ট বিকৃত করে রাষ্ট্রসংঘে ও আমেরিকায় প্রকাশ করা হয়েছে।

দুই) রাশিয়া-আমেরিকা সম্পর্ক ঃ ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি ভেনেজুয়েলা থেকে আর্জেন্টিনা পর্যন্ত সমগ্র লাতিন আমেরিকা জুড়ে একটা তেল ও গ্যাসের সরবরাহ নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়ে রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা (গ্যাস পাইপলাইন ও তেল) 'গাজপ্রোম'কে দায়িত্ব দেওয়ার পথে এগিয়েছেন। লাতিন আমেরিকার তেল ও গ্যাস ক্ষেত্রগুলির উত্তোলন ও বণ্টন প্রক্রিয়ার প্রযুক্তিগত দায়িত্ব নিয়ে বর্তমানে শেকড় গেড়ে থাকা আমেরিকা ও বৃটেনের যে কর্তৃত্ব এখন বজায় আছে পরিকল্পনাটির রূপায়ণ হলে তা আর থাকবে না। জ্বালানি বা শক্তিক্ষেত্রে ঐ দেশগুলির পাশ্চাত্যের ওপর নির্ভরশীলতা দারুনভাবে কমে যাবে—যা রাজনৈতিক প্রাধান্যকেও কমিয়ে দেবে। ইতিমধ্যেই বলিভিয়া তেল-গ্যাস ক্ষেত্রগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করেছে। এটা মার্কিন-বৃটেনের স্বার্থে ঘা দিচ্ছে। তেল ও গ্যাস ক্ষেত্রে অর্থাৎ জ্বালানি ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়নকেও আমেরিকা দাবিয়ে রাখতে চাইছে। আমেরিকার সেক্রেটারি অব স্টেট কণ্ডোলিজা রাইসের ভাষায় — আমেরিকাই হবে ''a monopoly of supply from one source''। কিন্তু তা বানচাল হয়ে যাচ্ছে রাশিয়ার জন্য। এনার্জি মার্কেটে আমেরিকার একাধিপত্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে রাশিয়া। আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের এই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই-এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে রাশিয়া এমন অবস্থানে পৌঁছেছে যে তার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা গাজপ্রোম একাধিপত্যের দ্বারা ইউরোপের তেল গ্যাস সঞ্চয় ও বিপণন কোম্পানিগুলির পাইকারি ও খুচরো ব্যবসা কিনে নিতে পারে যার ফলে ৩০ থেকে ৬০ বিলিয়ন ডলার বার্ষিক বাড়তি আয় ইউরোপ থেকেই রাশিয়ার পকেটে ঢুকবে। পশ্চিমী কোম্পানিগুলিকে রাশিয়ার তেল গ্যাস ক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ দিলেও পাইপলাইনের পূর্ণ কর্তৃত্ব থেকে পুটিন সরকার সরে আসছে না। ২০২০ সাল নাগাদ ইউরোপের চাহিদার ২৬% থেকে ৫০% এর যোগানদার হয়ে যাবে রাশিয়া। রাশিয়ার উপর ইউরোপের নির্ভরশীলতা বাড়বে। তাই বলা হচ্ছে পশ্চিমী দেশগুলিকে রাশিয়ার যতটা দরকার পশ্চিমী দেশগুলির রাশিয়াকে দরকার তার চেয়ে বেশি।

রাশিয়ার বৃহত্তম গ্যাসক্ষেত্র (Sufokman) বুরেন্ট সাগর এলাকার মজুত ভাণ্ডারটি পাকা সাতটি বছর ইউরোপের সমস্ত চাহিদাই মিটিয়ে দিতে পারে। [ফ্রন্টলাইন, ১১-৮-০৬]

পাশ্চাত্য দুনিয়ার উন্নত কারিগরি পাওয়ার জন্য রাশিয়া চাপ দিচ্ছে — যার ওপর অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা চাপানো আছে। যদিও ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময়ের সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াকে কোণঠাসা করে প্রযুক্তি রপ্তানির উপর লিখিত নিষেধাজ্ঞাটি আর নেই। এই চাপের ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ইতিহাসে প্রথম রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে পরমাণু চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। ইউরেনিয়াম ও উন্নততর রিঅ্যাক্টর দুটোই পেতে চায় রাশিয়া। কিন্তু তা কার্যকরী হতে পারছে না, কারণ রাশিয়া ইরানে দুটো পরমাণু চুল্লি তৈরি করে দিয়েছে ও চালাচ্ছে। আমেরিকা রাশিয়াকে চাপ দিচ্ছে সরে আসার জন্য। এটা হলে ইরানকে আমেরিকার কব্জায় আনা সহজ হবে, তাই রাশিয়ার ইরান নীতির পরিবর্তন ঘটা প্রয়োজন। রাশিয়া-আমেরিকা দ্বন্দ্ব তীব্র হচ্ছে। জি-৮-এর মিটিংয়ে তার প্রতিফলনও দেখা গেছে।

তিন) চীন-রাশিয়া সম্পর্ক ঃ রাশিয়ার সাথে চীনের সম্প্রতি চুক্তি হয়েছে। এই চুক্তির ফলে চীনে রাশিয়া দুটো গ্যাস পাইপলাইন গড়ে দেবে। এর ফলে বছরে ৮০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্যাস রাশিয়া চীনকে দেবে। আমেরিকা ও ইউরোপ এতে আশঙ্কিত। [সূত্র ঐ]

চার) চীন-অস্ট্রেলিয়া সম্পর্ক ঃ চীনের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার অসামরিক পরমাণু সহযোগিতা চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। এই চুক্তির বলে চীন অস্ট্রেলিয়ার ইউরেনিয়াম খনিক্ষেত্রগুলিতেও ঢুকতে পারবে। অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীর ইউরেনিয়াম ভাণ্ডারের ৪০ শতাংশের মালিক। সমাজতান্ত্রিক চীনকে অস্ট্রেলিয়া একঘরে করে রেখেছিল। পুঁজিবাদী চীনকে বয়কট করে চলার আর কারণ নেই। এজন্য এশিয়ার একমাত্র দেশ চীনের সাথে এখন এক চুক্তি হয়েছে। চীন পরমাণু শক্তিধর দেশ। পরমাণু চুল্লির উপযুক্ত প্রযুক্তি তার করায়ত্ত। আমেরিকার একান্ত অনুগত অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে এই চুক্তির পরই জাপান, অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে আমেরিকা তৈরি করেছে 'সিডনি ফোরাম'। একগুচ্ছ সামরিক চুক্তি এর অন্তর্ভুক্ত।

পাঁচ) রাশিয়া-ভারত সম্পর্ক ঃ ভারতবর্ষ রাশিয়ার কাছ থেকে পরমাণু চুল্লির জ্বালানি পায়। একাধিক পরমাণু প্রকল্প রাশিয়ার সহযোগিতায় চলছে। এছাড়া রাশিয়ার বৃহত্তম অস্ত্র বাজার হচ্ছে ভারতবর্ষ। এই বাজারে আমেরিকা ঢুকতে চায়। রাষ্ট্রদূত ডেভিড সি মালফোর্ড পরিষ্কার বলেছেন, ভারতের অস্ত্রের বাজারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ কম। এই বাজারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বড় বিক্রেতা হতে চায়। ভারতের অস্ত্রের বাজারের বড় অংশ দখল করা তার আকাঙ্ক্ষা। [সূত্রঃ দি হিন্দু, ৯-২-০৫]

ছয়) চীন-কাজাকস্তান সম্পর্ক ঃ কাজাকস্তান হচ্ছে ইউরেনিয়ামের দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাণ্ডার। ২০০৪ এর ফেব্রুয়ারিতে এই দু'টি দেশ চুক্তিবদ্ধ হয়েছে পরমাণু সহযোগিতা অর্থাৎ জ্বালানি সরবরাহের এবং ইউরেনিয়াম খনিগুলো ব্যবহার করার জন্য। সেন্ট্রাল এশিয়ান দেশগুলোর মধ্যে দু'টির সঙ্গে আরও জ্বালানি সংক্রান্ত চুক্তি হয়েছে। সুতরাং চীন পরমাণু জ্বালানি ও অন্যান্য জ্বালানি উৎসের ক্ষেত্রে যে বিরাট সুযোগ তৈরি করে নিয়েছে, এনার্জি বাজারে সেই থাবা আমেরিকার উদ্বেগের কারণ।

সাত) চীন-ভারত সম্পর্ক ঃ চীন-ভারত সম্পর্কও ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। ভারতে নানা ক্ষেত্রে বহু কোটি টাকার বিনিয়োগ করবার জন্য চীন এগিয়ে এসেছে। বন্দরগুলির আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে চীনের পুঁজি ঢুকতে চলেছে। সামরিক নিরাপত্তার যুক্তি তুলে অবশ্য বন্দর ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পথে একটা আপত্তি তুলেছে ভারত সরকার। চীনকে চাপ দিয়ে বাড়তি সুবিধা আদায়, আবার আমেরিকাকেও সন্তুষ্ট করা —দুইই উদ্দেশ্য।

আট) চীন-উত্তর কোরিয়া সম্পর্ক ঃ ১৯৬০ সালে চীন উত্তর কোরিয়া পারস্পরিক চুক্তির একটি মূলকথা হল, এদের যে কেউ আক্রান্ত হলে তারপক্ষে অপরকে দাঁড়াতে হবে। উত্তর কোরিয়া পরমাণু শক্তিধর হওয়ার ক্ষেত্রে আমেরিকা ও অন্যান্য শক্তি যে শান্তি বা পদক্ষেপ উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে নিতে চাইছে পুঁজিবাদী চীন তা না চাইলেও, আমেরিকার বিরুদ্ধে বলার শক্তি চীন হারিয়েছে। সুতরাং উত্তর কোরিয়াকে কেন্দ্র করেও চীন-আমেরিকার দ্বন্দ্ব আছে, যেমন আছে ইরানকে কেন্দ্র করে। সব মিলিয়ে উত্তর কোরিয়া ও ইরান প্রসঙ্গে চীনের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন চায় আমেরিকা। চীনের পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও বৃহৎ সামরিক শক্তি হিসাবে অভ্যুত্থানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। চীনের এই অভ্যুত্থান এশিয়ায় মার্কিন প্রভুত্বের সামনে একটা বাধা হিসাবে এসেছে। এই বাধাকে মোকাবিলা করার জন্য পাল্টা এশীয় শক্তি

ছয়ের পাতায় দেখুন

যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ ভগৎ সিং জন্মশতবর্ষ পালন করুন

একের পাতার পর

তিনি বলেছিলেন, ''মানবজীবন আমাদের কাছে কতখানি মূল্যবান তা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। অন্য কোনও মানুষকে সামান্যতম আহত না করে অতি শীঘ্রই মানবতার বেদীমূলে আমরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করব।''

''মানবজীবন আমাদের কাছে মহান। আমরা সেই ভবিষ্যতের স্বপ্নই দেখি, যেদিন মানুষের জীবনে আসবে পূর্ণ স্বাধীনতা, পরিপূর্ণ শান্তি। এতদ্‌সত্ত্বেও মানুষের রক্ত ঝরাতে আমরা বাধ্য হলাম, গভীর বেদনার সঙ্গে একথা আমরা স্বীকার করছি। যে মহান বিপ্লব মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান ঘটিয়ে সকল মানুষের জন্য স্বাধীনতা এনে দেবে, সেই মহান বিপ্লবী যজ্ঞে কিছু ব্যক্তির জীবন আহুতি দিতেই হয় — এ এক অনিবার্য সত্য।''

শুধু ব্রিটিশকে বিতাড়ন করাই নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সমাজের পুনর্গঠনও ছিল ভগৎ সিং-এর লক্ষ্য। ভারতীয় পার্লামেন্ট সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, ''সংসদ এখন কৈফিয়ৎহীন স্বেচ্ছাচারী শাসন এবং দমনমূলক রাষ্ট্রেরই প্রতীকে পরিণত হয়েছে।... জাঁকজমক বজায় রাখার জন্য কোটি কোটি মানুষের স্বেদসিক্ত অর্থব্যয় করা হচ্ছে, তারপরও সংসদ অনুভূতিহীন অভিনয়মঞ্চ এবং শয়তানিতে ভরা ষড়যন্ত্রের আখড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে... ভারতের কোটি কোটি মেহনতি মানুষের এই সংসদ থেকে পাওয়ার কিছুই নেই। এই সংসদ শোষকশ্রেণীর মদতদার, অসহায় শ্রমিকদের পরাধীনতার এক বীভৎস স্মারকমাত্র।'' বলিষ্ঠতার সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, দেশে যুদ্ধের পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং ''যতদিন পর্যন্ত মুষ্টিমেয় কিছু পরজীবী শোষক ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ ও খেটে খাওয়া মানুষদের শোষণ করবে, ততদিন পর্যন্ত এই পরিস্থিতি বজায় থাকবে। কেবলমাত্র ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা, কিংবা ব্রিটিশ ও ভারতীয়রা মিলিতভাবে, অথবা শুধুমাত্র ভারতীয় শোষকরা, যারাই শোষণ চালাক না কেন, এই যুদ্ধ চলতে থাকবে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের রূপও পাল্টাবে। কখনও যুদ্ধ হবে খোলাখুলি, কখনও বা গোপনে; কখনও তার রূপ হবে শুধুই বিক্ষোভমূলক, কখনও বা তা ভয়ঙ্কর জীবন-মরণ সংগ্রামের রূপ নেবে।'' যখন সমস্ত প্রকার শোষণের অবসান ঘটে সর্বহারাশ্রেণীর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে, সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে সমাজ গঠিত হবে, কেবলমাত্র তখনই এ যুদ্ধের অবসান ঘটবে। তিনি বলেছেন, ''পুঁজিবাদের সঙ্গে সঙ্গে সমস্তরকম শ্রেণীবৈষম্য ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাগুলিকে কবরে পাঠাবে বিপ্লব। দেশি-বিদেশি শোষকশ্রেণীর অত্যাচারের জোয়ালে আবদ্ধ লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষের জীবনে আনন্দ ও সমৃদ্ধি আনবে বিপ্লব। বিপ্লব জাতিকে স্বনির্ভর করবে, এক নতুন রাষ্ট্র, এক নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে।'' ভগৎ সিং তাঁদের সংগঠন 'হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন' (ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী সংঘ) -এর নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রেখেছিলেন 'হিন্দুস্তান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন' (ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী সংঘ)। মার্কসবাদের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং অত্যন্ত গভীরভাবে তা অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি এমনকী সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বিষয়েও আলোচনা করেছিলেন। লেনিনের নেতৃত্বকে তিনি গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং উদাহরণ তুলে ধরে তিনি দেখাতেন কীভাবে সোভিয়েট রাশিয়ায় দারিদ্র্য নির্মূল করা হয়েছে এবং সেই দেশটি কীভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে অগ্রাভিযান করছে। তিনি বলতেন, ''সমাজকে আমূলভাবে পরিবর্তিত করা প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজনের কথা যারা বুঝছে, তাদের কর্তব্য হল কার্ল মার্কসের তত্ত্ব অনুসরণ করে সমাজতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে সমাজকে পুনর্গঠিত করা।'' ''যতদিন পর্যন্ত এ না হচ্ছে এবং মানুষের দ্বারা মানুষের ও জাতির দ্বারা জাতির শোষণের অবসান না ঘটানো যাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত যন্ত্রণা ও হত্যালীলার হাত থেকে মনুষ্যত্বকে রক্ষা করা যাবে না। ততদিন পর্যন্ত, যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে সার্বিক শান্তির যুগে প্রবেশ করার কথা বলার অর্থ হল চূড়ান্ত ভণ্ডামি করা।'' ভগৎ সিং আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের প্রতি তাঁর সংহতি প্রকাশ করেছেন এবং গভীর বিশ্বাসের সাথে ঘোষণা করেছেন, ''সর্বহারা শ্রেণী বিজয়ী হবে। পুঁজিবাদ পরাজিত হবে। সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যু ঘটবে।'' অত্যন্ত তরুণ বয়সে তাঁর শহীদের মৃত্যুবরণ এদেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশের ক্ষেত্রে এক বিরাট আঘাত।

ভগৎ সিং ছিলেন দৃঢ়চেতা নিরীশ্বরবাদী; বস্তুবাদ, যুক্তি ও বিজ্ঞানের প্রতি ছিল তাঁর সুদৃঢ় প্রত্যয় এবং নিজের ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিও তিনি স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করেছেন। মানবসভ্যতার বিকাশের সঙ্গে কীভাবে ধর্মীয় চিন্তার উদ্ভব হয়েছিল, সমাজবিকাশের সেই প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর যথাযথ ধারণা ছিল। আবার তিনি দেখিয়েছেন, শোষকশ্রেণী কীভাবে ধর্মকে ব্যবহার করে মানুষকে প্রতারিত এবং শৃঙ্খলিত করেছে। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, সমস্ত ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক কারণ। ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং জাতপাত-সম্প্রদায়কে ভিত্তি করে মানুষে মানুষে ভেদাভেদের বিরুদ্ধতা করেছেন ভগৎ সিং। 'গদর' আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, ''১৯১৪-১৫ সালে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন, তাঁরা ধর্মকে রাজনীতির বাইরে রেখেছিলেন। তাঁরা মনে করতেন, ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়। অন্যদের এর মধ্যে নাক গলানো কিংবা রাজনীতির মধ্যে ধর্মকে ঢোকানো উচিত নয়।''

এভাবেই, সকলপ্রকার শোষণ থেকে মুক্ত দেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে এবং দেশবাসীর মনেও সেই স্বপ্ন সঞ্চারিত করে ভগৎ সিং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মাঝে সকলকে ছাপিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর জন্মের পর একশো বছর অতিক্রান্ত। তাঁর জন্মশতবর্ষে আজ এই মহান বিপ্লবীর প্রতি অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা অর্পণ করতে গিয়ে দেশবাসীর মনে যে প্রশ্ন আলোড়ন তুলছে তা হ'ল — এত ত্যাগস্বীকার ও প্রাণদান সত্ত্বেও ভগৎ সিংয়ের মতো বিপ্লবীদের স্বপ্ন সফল হ'ল না কেন; কেনই বা দেশ ও দেশের সাধারণ মানুষ আজ সর্বাত্মক সঙ্কটে জর্জরিত, কেন তাদের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল? স্বাধীনতার পর অর্ধ শতক অতিক্রান্ত। আজ যখন বিশ্বের ১০০ জন সবচেয়ে ধনী ব্যক্তির মধ্যে ১০ জন ভারতীয়, তখনই এই দেশ বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক দরিদ্রতম মানুষের বাসস্থান। শত শত কোটি টাকার মুষ্টিমেয় মালিকের পাশাপাশি দেশের কোটি কোটি মানুষ আজ দারিদ্র্যসীমার নীচে। এদেশের সাধারণ মানুষের জীবন এখন দুঃসহ দারিদ্র্য, ভয়ঙ্কর বেকারি, জীবনের সর্বত্র ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তাহীনতা, নির্লজ্জ দুর্নীতি ও সর্বব্যাপী অধঃপতনের সম্মুখীন। স্বাধীনতার দীর্ঘ বছর পরেও আজও শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ক্রমেই মানুষের আরও নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। চূড়ান্ত মূল্যবোধহীনতা ও ভয়ঙ্কর অবক্ষয় জনসাধারণের জীবনে গভীর সঙ্কট ডেকে এনেছে। ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতালাভেচ্ছু শক্তিগুলির রাজনৈতিক, আর্থিক প্রকাশ্য ও গোপন মদতে মৌলবাদ ও জাতিগত বিদ্বেষের উন্মাদনা জনগণের ঐক্য ও সংহতি দুর্বল করে দিয়ে তাদের শোষণ-নিপীড়নের অসহায় শিকারে পরিণত করছে। এই পরিস্থিতির কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এ যুগের অগ্রগণ্য মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ এদেশের জনগণকে দেখিয়েছেন, ঐতিহাসিক কারণেই আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম দু'টি সুস্পষ্ট বিপরীত স্বার্থবোধ ও ধারায় বিভক্ত ছিল। একটি ধারা পরিচালিত হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে এদেশের বুকে শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কায়েম করার উদ্দেশ্য নিয়ে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি আপসমুখী সংস্কারবাদী পথে চলা এই ধারাটিই ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান ধারা। অন্য ধারাটি জনগণের বিপ্লবী তেজ ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরেছিল এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীনভাবে লড়াই করেছিল। শুধু স্বাধীনতা অর্জন করাই নয়, এই ধারাটির লক্ষ্য ছিল মানুষের দ্বারা মানুষের যাবতীয় শোষণের অবসান ঘটানো। স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসমুখী নেতৃত্ব এদেশের ব্যাপক জনগণের রাজনৈতিক চেতনার অভাবের সুযোগ নিয়েই নিজেদের প্রভাব বাড়াতে সফল হয়। একাজ তারা পারত না যদি এদেশে কমিউনিজমের পতাকা নিয়ে চলা দলটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি হত। তা না হওয়ার ফলে ঐ পার্টি ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে কমিউনিস্টদের কর্তব্য সম্পর্কে লেনিনের অমূল্য শিক্ষাগুলিও অনুধাবন করতে পারেনি এবং জনগণকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে আপসমুখী নেতৃত্বের পৃষ্ঠপোষক ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী শেষ পর্যন্ত স্বাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষমতাও দখল করেছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ আরও দেখিয়েছেন যে, আজ জনগণকে সর্বপ্রকার শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করতে হবে। তিনি আরও বলেছেন যে, এদেশের শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী

আটের পাতায় দেখুন

দিল্লিতে শহীদ ভগৎ সিং স্মরণে সভা

গত ২৮ সেপ্টেম্বর দিল্লির ফিরোজ শাহ্ কোটলা ময়দানের শহীদ পার্কে শহীদ ভগৎ সিং জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে শহীদ ভগৎ সিং স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে এ আই ডি এস ও, এ আই ডি ওয়াই ও, এ আই এম এস এস, ইউ টি ইউ সি-এল এস এবং অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সকাল ১০টায় ভগৎ সিংয়ের বিভিন্ন রচনা থেকে তাঁর চিন্তার কিছু মূল্যবান অংশ এবং ছবি নিয়ে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ইউ টি ইউ সি-এল এসের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী। বিকালে এ আই এম এস এসের সভানেত্রী কমরেড ছায়া মুখার্জীর সভাপতিত্বে প্রকাশ্য জনসভায় ভগৎ সিংহের জীবন ও সংগ্রাম নিয়ে বক্তব্য রাখেন দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচার, অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের সদস্য অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় এবং নরেন্দ্র শর্মা, ইউ টি ইউ সি-এল এসের হরিয়ানা রাজ্য সভাপতি কমরেড সত্যবান, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুধাংশু মালবিয়া, এ আই ডি এস ও'র সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড প্রতাপ সামল, বিহারের জননেতা এবং এ আই ডি এস ও'র প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড অরুণ সিং। অনুষ্ঠানে একক ও গ্রুপসঙ্গীত পরিবেশন ছাড়াও দিল্লি এবং পাঞ্জাব রাজ্যের পক্ষ থেকে প্রাদেশিক ভাষায় নাটক মঞ্চস্থ হয়। সভায় চারদফা দাবি সম্বলিত এক প্রস্তাব গৃহীত হয় — (১) সমস্ত জনবিরোধী নীতি বাতিল করতে হবে, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-স্বাস্থ্য-শিক্ষা প্রতিটি নাগরিকের জন্য সুনিশ্চিত করতে হবে; (২) সিলেবাসে এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ভগৎ সিং সহ বিপ্লবীদের জীবনসংগ্রাম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; (৩) শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে ভগৎ সিংয়ের মূর্তি স্থাপন করতে হবে এবং রাস্তা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম ভগৎ সিংয়ের নামাঙ্কিত করতে হবে; (৪) ২৩ মার্চ ভগৎ সিংয়ের শহীদ দিবসকে জাতীয় যুব দিবস হিসাবে ঘোষণা করতে হবে।

এই অনুষ্ঠানে কেরালা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, রাজস্থান, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন।

বক্তব্য রাখছেন দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচার। শহীদ পার্কে সমাবেশের একাংশ

ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি প্রসঙ্গে

চারের পাতার পর

হিসাবে ভারতকে বেছে নিয়েছে আমেরিকা।

নয়) চীন-পাকিস্তান সম্পর্ক ঃ চীনকে পাকিস্তান প্রস্তাব দিয়েছে পরমাণু প্রযুক্তির জন্য। পাকিস্তানের সঙ্গে ইরানের সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ। পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে ইরান থেকে গ্যাস পাইপলাইন ভারতে ঢুকবে। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কও এই উপলক্ষ্যে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। এর ফলে ভারত-পাকিস্তান সামরিক উত্তেজনাও দু'দেশই যেন কমাতে চাইছে, যা আমেরিকার কাম্য নয়। পাকিস্তানে ভারতের রপ্তানি চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

দশ) জাপান-উজবেকিস্তান ও জাপান-কাজাকস্তান সম্পর্ক ঃ উজবেকিস্তানের ইউরেনিয়াম ভাণ্ডার দশ নম্বরে, আর কাজাকস্তানের মজুত ভাণ্ডার দ্বিতীয় বৃহত্তম। এই দু'টি দেশের সাথেই জাপান পরমাণু জ্বালানি ও প্রযুক্তি নিয়ে এবং ঐ দু'দেশের ইউরেনিয়াম খনিগুলোর অনুসন্ধান নিয়ে চুক্তি করেছে। [দি স্টেটসম্যান, ৩১-৮-০৬]

এগারো) আমেরিকা-বৃটেন ও ইরান সম্পর্ক ঃ ইরানকে ঘিরে পরমাণু শক্তিধর বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব বাড়ছে। চীন, ফ্রান্স, জাপান, জার্মানি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পক্ষে। কার্যত আমেরিকা-বৃটেন বিচ্ছিন্ন। ইস্রায়েলের পাশে তুল্যমূল্য শক্তি নিয়ে ইরানের উত্থান হলে এতদঅঞ্চলে মার্কিনী প্রভুত্ব চ্যালেঞ্জের সামনে পড়বে। অথচ এই ইরানকেই ব্রিটেন ৭০-এর দশকে (টনি বেন যখন ব্রিটেনের সেক্রেটারি অব স্টেট ফর এনার্জি ছিলেন) ব্যাপক পরমাণু প্রযুক্তির প্রস্তাব দিয়েছিল। আমেরিকা, ফ্রান্সের সংস্থাগুলিও তখন ইরানকে পরমাণু শক্তিতে বলীয়ান করার প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। সেদিন পরমাণু প্রযুক্তিতে ইরানের শক্তিধর হয়ে ওঠার মধ্যে আমেরিকা কোন বিপদ দেখেনি। [সূত্র ঃ ফ্রন্টলাইন, ১২-২-০৬] কারণ তখন ইরানের প্রেসিডেন্ট শাহ্ ছিলেন আমেরিকার সহযোগী। সি আই এ-র সাহায্যে ক্যুপ ঘটিয়ে আমেরিকা শাহকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। আজ জমানা পাল্টেছে। তথাকথিত ইসলামিক বিপ্লবের পর, যে শক্তি ক্ষমতায় এসেছে তারা ঘোর আমেরিকা বিরোধী। আজ যে কারণে বিরোধিতা করা হচ্ছে ইরানের পরমাণু প্রযুক্তির, সেদিন সমর্থন করা হচ্ছিল একই কারণে। ইজরায়েলের পাশে আমেরিকার অনুগত পরমাণু শক্তিধর ইরান পশ্চিম এশিয়ায় থাকলে সমগ্র এলাকায় মার্কিন প্রভুত্ব নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ। অভূতপূর্ব তেল ও গ্যাস ভাণ্ডারটির ওপর প্রভুত্ব রাজনৈতিক প্রভুত্বের পথে আমেরিকার বহুগুণ সুবিধা করে দিতে পারত। তবে নিজেদের মধ্যে কামড়া কামড়ি ও হুঙ্কার যতই হোক, খোদ আমেরিকার ভিতর থেকেই হুঁশিয়ারি উঠেছে, ইরান সমস্যার সমাধান এমন ভাবে করতে হবে যাতে ইরান হাতের বাইরে চলে না যায়। [সূত্র ঃ ফ্রন্টলাইন, ১০-২-০৬]

এছাড়া চীন বিপুল পরিমাণে সামরিক শক্তি বাড়িয়ে তুলছে। এশিয়ায় এমন শক্তির অভ্যুত্থান মার্কিন আধিপত্যের পক্ষে অনুকূল নয়। অপরিশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিশাল ক্রেতা হিসাবে চীন বড় বড় ক্রেতা দেশগুলির মিটিং সংগঠিত করছে। পৃথকভাবে ভারতও একই ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে। যুক্ত উদ্যোগ হলে তা তেল বাজারে একটা চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। তেল যোগানের ক্ষেত্রে ওপেক গত ২৫ বছরের মধ্যে বর্তমানে সর্বোচ্চ প্রতিদিন ২৮ মিলিয়ন ব্যারেল তেল উৎপাদন করলেও ২০০২ এর তুলনায় তেলের মূল্য তিনগুণ হয়েছে এবং ২০০৭-এ উৎপাদন কমে যাবে বলে বিশেষজ্ঞদের অনুমান। বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ তেল উৎপাদনকারীদের এটা বেশ উদ্বেগের কারণ। [দি টেলিগ্রাফ, ১২-৯-০৬]

সাধারণভাবে বলতে গেলে ১ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধির জন্য দরকার হয় ১.৫ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি। ভারতের গড় জিডিপি বৃদ্ধি বছরে ৬.৪ শতাংশ। অথচ বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি বছরে ৪.১ শতাংশ। নবম পরিকল্পনার পরও বিদ্যুৎ ঘাটতি ৪০ বিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা [দি হিন্দুস্তান টাইমস, ৮-৮-০৬]

এই পরিস্থিতিতে ইউরেনিয়ামের দামও বেড়েছে ৬ গুণ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তির (Energy) বাজারে চাহিদা বাড়ছে। প্রতিযোগিতাও বাড়ছে। শক্তির উৎসগুলোর—তেল, গ্যাস, ইউরেনিয়াম-এর মজুত আবিষ্কৃত ভাণ্ডারগুলির এবং অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলির অনুসন্ধান পূর্বক দখল করা, এগুলির অংশীদার হওয়ার জন্য পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্রতর হচ্ছে। প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ দু'রকম দখলীসত্ত্ব কায়েম করার জন্য উন্মত্ত এক প্রতিযোগিতায় বড় বড় একচেটিয়া এনার্জি সংস্থাগুলোর মরণপণ লড়াই চলছে। এই ক্ষেত্রে ভারতও বিশ্ব পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগী। শক্তিক্ষেত্রগুলোর ওপর প্রভাব ও প্রভুত্ব রাজনৈতিক প্রভুত্বের অস্ত্র। তাই রাজনৈতিক প্রভুত্ব কায়েম করতে সামরিক প্রভুত্ব ও ক্ষমতাকে কাজে লাগানো হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বজুড়ে স্থায়ী সর্বাত্মক অর্থনৈতিক মন্দার বাজারে, সোভিয়েত ও চীন সহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে অধঃপতিত হওয়ায়, প্রতিযোগীর সংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি হওয়ায় বিশ্ব পুঁজিবাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রয় ক্ষমতার বিপুল সংকোচনের এমন এক পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদী অর্থনীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে অর্থনীতির সামরিকীকরণের প্রবণতাটি নজিরবিহীনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই সমর অর্থনীতির দাপট বৃদ্ধির দরুন শক্তির বড় অংশই ব্যয় হয় অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ ও আমদানি রপ্তানিতে এবং যুদ্ধ ব্যবসার পরিপূরক শিল্প ক্ষেত্রগুলিতে। কৃত্রিমভাবে অর্থনীতিতে এক তেজিভাব সাময়িকভাবে বজায় রাখা হয় এভাবেই। তাই এনার্জি মার্কেটে প্রতিযোগিতা ও চুক্তিগুলোর সঙ্গে সমরাস্ত্র ব্যবসাও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়। পারস্পরিক চুক্তিভিত্তিক স্থিতি, যার জন্ম এক যুদ্ধের গর্ভ থেকে, এগিয়ে চলে যে আর এক যুদ্ধের দিকে। শান্তির স্থিতি যুদ্ধ প্রস্তুতির অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক এই চুক্তি ও দ্বন্দ্বগুলি থেকে বোঝা যায় যে, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান, তার ইতিমধ্যেই গড়ে ওঠা বিশাল মজুত সমর পরিকাঠামো, আঞ্চলিক সুপার পাওয়ার হিসাবে প্রভুত্বকামী তাগিদ ব্যবহার করে চীন-রাশিয়াকে কোণঠাসা করার ক্ষেত্রে, ইরানের প্রশ্নে, উত্তর কোরিয়ার প্রশ্নেও ভারতকে কাজে লাগাতে পারে আমেরিকা। ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় আমেরিকার প্রভুত্বের সহযোগী শক্তি হিসাবে ভারতকে ব্যবহার করার সুযোগও আসতে পারে। চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলা যেতে পারে। এশিয়ায় চীনের উদীয়মান চ্যালেঞ্জের বিকল্প হিসাবে ভারতের শক্তি সাহায্যকারী হতে পারে। ইরানের ভারতীয় শক্তি বাজার-এর ওপর থাবা দিতে পারলে ইরানকে চাপে ফেলাও যায়।

(আগামী সংখ্যায়)

উত্তর ভারত রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির

২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর হরিয়ানার সোনেপত শহরে এস ইউ সি আইয়ের উত্তর ভারত রাজনৈতিক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। দিল্লি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশের গুনা ও গোয়ালিয়ার জেলার কর্মীরা এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষাশিবির পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী। এছাড়া এ আই এম এস এস সভানেত্রী কমরেড ছায়া মুখার্জী, বীণাপাণি দাস, প্রতাপ সামল, অমিন্দর পাল সিং, হরি প্রকাশ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম অধিবেশনে বস্তুনিষ্ঠ অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা, চিন্তা এবং ভাবের উৎপত্তি, মনগড়া চিন্তা ও বস্তুনিষ্ঠ চিন্তার পার্থক্য এবং সত্য নির্ধারণের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে দর্শন, বস্তুবাদী ও ভাববাদী দর্শন এবং দ্বন্দ্বতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হয়। বস্তু সংক্রান্ত ধারণা এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদের কিছু দিক নিয়ে আলোচনা হয় তৃতীয় অধিবেশনে। চতুর্থ অধিবেশনে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নীতি ও পঞ্চম অধিবেশনে লেনিনীয় মডেলে কমরেড শিবদাস ঘোষ কর্তৃক সমৃদ্ধ সর্বহারা শ্রেণীর প্রকৃত মনোলিথিক পার্টি গঠন, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা এবং সংগঠন সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয়। সর্বশেষ অধিবেশনে কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার প্রয়োজনে দল ও গণসংগঠনগুলি শক্তিশালী করার জরুরি প্রয়োজনীয়তা এবং জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদের ত্রুটিমুক্ত করে দল ও গণসংগঠনগুলিকে সংহত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

এ আই ডি এস ও'র ৫ম বিহার রাজ্য সম্মেলন

শিক্ষার বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে এবং ধর্মনিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক শিক্ষার দাবিতে গত ১৯-২০ সেপ্টেম্বর ভাগলপুরে এ আই ডি এস ও'র ৫ম বিহার রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রকাশ্য অধিবেশন উদ্বোধন করেন ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রামজি সিং। প্রধান অতিথির ভাষণে এস ইউ সি আই বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড শিবশঙ্কর শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উদাসীনতার তীব্র সমালোচনা করেন। ২০ সেপ্টেম্বর প্রতিনিধি অধিবেশনে ভাগলপুর, মুঙ্গের, পাটনা, জাহানাবাদ, আরা, মুজফফরপুর, দ্বারভাঙা, মধুবনী, মাধেপুরা, কাটিহার, পূর্ণিয়া, খাগড়িয়া প্রভৃতি জেলার ৬০০ জন ছাত্র প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষার বেসরকারীকরণের সুরে সুর মিলিয়ে কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন এন এস ইউ আই এবং বিজেপির ছাত্র সংগঠন এবিভিপি ছাত্রস্বার্থবিরোধী যে ভূমিকা পালন করছে প্রতিনিধিরা তার তীব্র সমালোচনা করেন। এস এফ আই এবং এ আই এস এফের আন্দোলন বিমুখতারও তারা নিন্দা করেন। সম্মেলনের প্রধান বক্তা এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দীপঙ্কর রায় উন্নত চরিত্র ও নৈতিকতার ভিত্তিতে সাহসের সাথে ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করে শিক্ষার সমস্যা সমাধানের আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। সম্মেলনে সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি কমরেড সুব্রত গৌড়ী, গুজরাট রাজ্য সভাপতি কমরেড জয়েশ প্যাটেল, মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সভাপতি কমরেড রামঅবতার শর্মা, ওড়িশা রাজ্য সভাপতি কমরেড রাজেন্দ্র বর্মা, ঝাড়খণ্ড রাজ্য সম্পাদক কমরেড মোহন সিং, বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড দীপক কুমার বক্তব্য রাখেন। কমরেড সাধনা মিশ্রকে সভাপতি, কমরেড সূর্যকর জীতেন্দ্রকে সম্পাদক এবং রাজকুমার চৌধুরীকে কোষাধ্যক্ষ করে নতুন রাজ্য কমিটি গঠিত হয়েছে।

উত্তর কোরিয়াকে ঘিরে রেখেছে মার্কিন মিলিটারি

একের পাতার পর

দশক ধরে মার্কিন সরকারই দক্ষিণ কোরিয়ায় একের পর এক স্বৈরাচারী সরকারকে ক্ষমতায় বসতে মদত দিয়ে এসেছে।

১৯৫০ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত মার্কিন নেতৃত্বেই উত্তরের বিরুদ্ধে নৃশংস যুদ্ধ চালানো হয়েছিল, দৈনিক ৮০০ টন করে বোমা ফেলেছিল আমেরিকা। আগুনবোমায় এমন থকথকে পেট্রল ব্যবহার করেছিল, যা মানুষের চামড়ার সাথে এঁটে যায় ও ভয়াবহ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে মানুষের মৃত্যু ঘটায়। মার্কিন ধ্বংসকাণ্ড থেকে উত্তর কোরিয়ার কোনও একটি শহর, গ্রাম ও নগর বাদ ছিল না। সব ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। ৪০ লক্ষ কোরিয় জনগণ নিহত হয়েছিল। মার্কিন সেনাদের এই নারকীয় অত্যাচারের বীভৎস চিহ্নগুলি আজও দেখতে পাওয়া যায়। যুদ্ধবিরতির আলোচনা চলার সময়ও মার্কিন শাসকরা ক্রমাগত আণবিক অস্ত্র প্রয়োগের হুমকি দিয়েছে।

সঙ্কট কাটাবার পথ কী

কোরিয় উপদ্বীপ ও সংলগ্ন অঞ্চলে যে সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে, তার সমাধান হয়ে যায় যদি বুশ সরকার তিনটি বুনিয়াদী কাজ করে ঃ (ক) গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়ার সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দেয়; (খ) দুই দেশের মধ্যে স্বাভাবিক কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে; (গ) মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়ার নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেয়। উত্তর কোরিয়া, কোরিয়ার যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে ৫০ বছর ধরে এই পদক্ষেপগুলি চেয়ে আসছে। উপরন্তু, কোরিয় উপদ্বীপ ও তার চারপাশের অঞ্চল আণবিক অস্ত্রমুক্ত করার জন্য উত্তর কোরিয়া অসংখ্য প্রস্তাব দিয়েছে। সর্বোপরি, তারা বলেছে, এই ধরনের স্থিতিশীল ও শান্তির পরিস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য উভয় দেশের মধ্যে একটা শান্তি চুক্তি হওয়া দরকার, যেটা দুই দেশের মধ্যে যে যুদ্ধ পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তার নিয়মানুগ সমাপ্তি ঘটাবে। কিন্তু মার্কিন শাসকরা গত ৫০ বছর ধরেই এই প্রস্তাবগুলি প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। বৃহৎপুঁজি নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম ও পুঁজিবাদী সরকারগুলো উত্তর কোরিয়া সম্পর্কে এমন সব মন্তব্য করছে যেন উত্তর কোরিয়ার নেতারা মিথ্যা আতঙ্কের রোগে ভুগছে এবং তারা সবাই যুক্তিবিচারবোধহীন মানুষ। বাস্তব তথ্য কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী হুমকি

২০০২ সালের জানুয়ারি মাসে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ, ইরাক ও ইরানের পাশাপাশি উত্তর কোরিয়াকেও ''শয়তানের অক্ষ''-এর অংশ বলে চিহ্নিত করেন। এই সময়ই আণবিক অস্ত্র প্রয়োগ করার বিষয়ে একটা পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য জর্জ বুশ মার্কিন সামরিক বিভাগ পেন্টাগনকে নির্দেশ দেন। এর একটা অংশ ফাঁস হয়ে গেলে দেখা যায়, যে ৭টি দেশ পেন্টাগনের টার্গেটের মধ্যে আছে, তার অন্যতম হচ্ছে উত্তর কোরিয়া।

২০০২ সালের সেপ্টেম্বরে বুশ সরকারের জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনায় 'প্রিএমটিভ ওয়ার', অর্থাৎ অন্যেরা আক্রমণ করার আগেই মার্কিন বাহিনী আক্রমণ চালাবে বলে ঘোষণা করা হয় এবং এই আক্রমণের উদ্দেশ্য হবে টার্গেট করা দেশটিতে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো (রেজিম চেঞ্জ)। জর্জ বুশ কথিত 'শয়তানের অক্ষ' ভুক্ত দেশগুলির জন্যই যে এই ফরমান, একথা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। এর ঠিক ৬ মাস পরই মার্কিন সরকার ইরাকের শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন করার জন্য বিনাপ্ররোচনায় এবং আক্রান্ত না হয়েই আগ্রাসন চালায় এবং সাদ্দাম হোসেন সরকারকে উচ্ছেদ করে।

আন্তর্জাতিক পরমাণু অস্ত্র তদারকি কমিশনকে অনুসন্ধান চালাবার অনুমতি সাদ্দাম হোসেন দিয়েছিলেন। কমিশন তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এমন কোন চিহ্ন পায়নি যা থেকে তারা বলতে পারে ইরাক পরমাণু অস্ত্র বানাচ্ছে। বিশ্বের ওয়াকিবহাল মহল বার বার বলেছে, পরমাণু বোমা তৈরি ও তা প্রয়োগের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে অগ্রগতি দরকার, ইরাকের তা নেই, যদিও মনে রাখা দরকার আত্মরক্ষার্থে সেই সামরিক ক্ষমতা অর্জনের অধিকার অন্যান্য দেশের মতো ইরাকেরও ছিল। ইরাক আক্রমণের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের অনুমতি মার্কিন শাসকরা পায়নি। তৎসত্ত্বেও যুদ্ধবাজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যেভাবে আন্তর্জাতিক আইন পদদলিত করে ইরাকের ওপর তেজস্ক্রিয় অস্ত্র, ভয়ংকর ক্ষেপণাস্ত্র, অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাতে পরিষ্কার যে শয়তানের শর্তে রাজি হলেও বাঁচা যাবে না। বাঁচতে হলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে, পাল্টা ধমকি দিতে হবে।

উত্তর কোরিয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারির প্রতিবাদে ১৭ অক্টোবর কলকাতায় মার্কিন প্রচার দপ্তরের সামনে জর্জ বুশ-এর কুশপুতুল পোড়ানো হচ্ছে

আত্মরক্ষার জন্য সেই পথই নিয়েছে উত্তর কোরিয়া।

কোরিয়ার বিরুদ্ধে হুমকিগুলো দিচ্ছিল আমেরিকার মতো একটা সুপার পাওয়ার যার নিজের কবজাতেই রয়েছে ১০ হাজার পরমাণু অস্ত্র, যার অর্থনীতির শক্তি (জিডিপি) ১০ লক্ষ কোটি ডলার, যার জনসংখ্যা ৩০ কোটি এবং যে আমেরিকা গোটা এশিয়া জুড়ে, বিশেষত উত্তর কোরিয়া সংলগ্ন অঞ্চলে ভয়াবহ বিধ্বংসী ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্রসম্ভার সাজিয়ে রেখেছে। পাশাপাশি উত্তর কোরিয়ার ক্ষমতা কতটুকু? মাত্র ২ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষের এই দেশটির অর্থনীতির (জিডিপি) পরিমাণ ১৬০০ কোটি ডলার। শুধু তাই নয়, উত্তর কোরিয়ার অর্থনীতিকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য আমেরিকা গত ৫০ বছর ধরে এই দেশটির উপর আর্থিক নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে রেখেছে।

উত্তর কোরিয়াকে ঘিরে রেখেছে মার্কিন মিলিটারি

গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়াকে ঘিরে মার্কিন অস্ত্রসজ্জা ব্যাপক। আণবিক বোমা ফেলার বিমান, আণবিক অস্ত্রবাহী সাবমেরিন, ক্ষেপণাস্ত্র, যুদ্ধবিমান নিয়ে নৌবহর ইত্যাদি দিয়ে আমেরিকা ঘিরে রেখেছে উত্তর কোরিয়াকে। এছাড়া দক্ষিণ কোরিয়ায় মজুত রয়েছে ৩০ হাজার মার্কিন সেনা। বহু হাজার দক্ষিণ কোরিয় সেনাও রয়েছে, যারা কার্যত মার্কিন উচ্চ সামরিক কর্তাদের হুকুমেই পরিচালিত হয়। এই ব্যাপক অস্ত্রসজ্জার লক্ষ্য একটাই — উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

এবছরই জুন মাসে কোরিয় উপদ্বীপে আমেরিকা 'মিনিটম্যান-৩' নামক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করেছে। পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরে তিনটি গ্রুপে ভাগ করে আমেরিকা নৌযুদ্ধের মহড়া দিয়েছে, যার সঙ্গে যুক্ত ছিল ২২ হাজার সৈন্য, কয়েক ডজন যুদ্ধবিমান, ভারি বোমারু বিমান প্রভৃতি। এতবড় নৌযুদ্ধ সমাবেশ ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর আর হয়নি। দূর নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্রবাহী দুটি ডেস্ট্রয়ার — ইউ এস এস কার্টিস উইলবার ও ইউ এস এস ফিট জেরাল্ড উত্তর কোরিয়ার উপকূল ঘেঁষে ঘাঁটি গেড়ে আছে। এই সময়ে আমেরিকা উত্তর কোরিয়ায় ১৭০ বার গোয়েন্দা বিমান পাঠিয়েছে।

মার্কিন যুদ্ধবাজরা সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে দেয়নি

পারমাণবিক সঙ্কট সৃষ্টি করা দূরের কথা, বরং উত্তর কোরিয়া বারবার চেষ্টা করেছে যাতে আণবিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথে তাকে যেতে না হয়। কিন্তু চুক্তি বা সমঝোতার কোনও সম্ভাবনা দেখা দিলেই মার্কিন সরকার অথবা মার্কিন কোনও সামরিক চক্র নানা প্রশ্ন তুলে তাতে বাধা দিয়েছে।

২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে, আমেরিকা, চীন, রাশিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে ছয় দেশিয় বৈঠকে উত্তর কোরিয়া একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। ঐ চুক্তিতে গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়া ''সকল প্রকার আণবিক অস্ত্র ও চালু আণবিক কর্মসূচিগুলি পরিত্যাগ করার'' অঙ্গীকার করেছিল। প্রত্যুত্তরে আমেরিকা ও উত্তর কোরিয়া পরস্পর পরস্পরের সার্বভৌমত্বকে মর্যাদা দেবে, উভয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করবে এবং নিজেদের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য পদক্ষেপ নেবে বলে চুক্তিতে বলা হয়েছিল।

এর ঠিক চারদিন পর চুক্তিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে মার্কিন ট্রেজারি দপ্তর উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে ব্যাপক আর্থিক নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেয়। উত্তর কোরিয়াকে ''অপরাধী রাষ্ট্র'' মার্কা দিয়ে অভিযোগ তোলা হয় যে, উত্তর কোরিয়া অবৈধ অর্থের কারবার ও গণবিধ্বংসী অস্ত্রের বেআইনি ব্যবসা করছে। আর্থিক নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য ছিল, আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সুযোগ যাতে উত্তর কোরিয়া নিতে না পারে (নিউজ উইক, ১০-১০-০৫)। আণবিক অস্ত্রসংক্রান্ত বিরোধ নিয়েও আমেরিকা ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে ২০০৪ সালে একটা চুক্তি হতে যাচ্ছিল, যেটা শেষ পর্যন্ত মার্কিন সরকার বাতিল করে দেয়।

উত্তর-দক্ষিণ মীমাংসা আলোচনার বিরুদ্ধতায় আমেরিকা

১৯৯৯ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার নতুন প্রধানমন্ত্রী হন কিম দে জং। উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলার নীতি (সানশাইন পলিসি) নেবেন বলে তিনি ঘোষণা করেন। ২০০০ সালে কিম দে জং পিয়ংইয়ং-এ উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম্ জং ইল-এর সাথে এক ঐতিহাসিক বৈঠকে মিলিত হন। ২০০১ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে বসে জর্জ বুশ দক্ষিণ কোরিয়ার কিম দে জং-এর সাথে সাক্ষাৎ করতেই অস্বীকার করেন, যার দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, ঐ অঞ্চলে সামরিক উত্তেজনা প্রশমনের কোনরকম চেষ্টা করলে এবং উত্তর কোরিয়ার সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চাইলে মার্কিন সরকার তা মেনে নেবে না।

প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টনের সময়ও মার্কিন প্রশাসন উত্তর কোরিয়াকে হেয় করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে ক্লিন্টন উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে অপারেশন টিম স্পিরিট নামে যুদ্ধপ্রস্তুতিতে সম্মতি দিয়েছিলেন। ১৯৯৪ সালে উত্তর ও দক্ষিণের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে গিয়ে ক্লিন্টন উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার হুমকি পর্যন্ত দেন।

আণবিক অস্ত্রপ্রসাররোধ চুক্তি থেকে যখন উত্তর কোরিয়া সরকার নিজেদের প্রত্যাহার করার হুমকি দিয়েছিল, তখন ক্লিন্টন এমনকী আণবিক যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্যন্ত শুরু করে দেন। তাঁকে নিরস্ত্র করার জন্য টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে আধঘণ্টারও বেশি পীড়াপীড়ি করতে হয়েছিল দক্ষিণ কোরিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট কিম ইয়ং সামকে। আণবিক আক্রমণের বিপদের সম্মুখীন হয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম ইল সুঙ পূর্বতন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারকে আলোচনায় আহ্বান জানান। জেনিভায় আলোচনার শেষে কার্টার একটি চুক্তির কথা ঘোষণা করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়ার যেহেতু নিজস্ব তেল বা গ্যাসের ভাণ্ডার নেই, তাই বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য তারা তখন আণবিক শক্তি তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছিল। কার্টারের সঙ্গে উল্লিখিত চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকার কাছ থেকে দুটি লাইট ওয়াটার রিঅ্যাক্টর পাওয়ার বিনিময়ে উত্তর কোরিয়া দুটি চালু পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর বন্ধ করে দিতে ও আরও যে দুটি রিঅ্যাক্টর তৈরির চেষ্টা করছিল, সেগুলিও বাতিল করতে সম্মত হয়। কথা ছিল ২০০৩ সালের মধ্যে আমেরিকা রিঅ্যাক্টরগুলি তৈরির ব্যবস্থাদি করে দেবে এবং ইতিমধ্যে জ্বালানি তেল সরবরাহ করবে। একথাও ছিল যে, ইতিমধ্যে উত্তর কোরিয়ার উপর থেকে আমেরিকা অবরোধ তুলে নেবে, তার সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দেবে, স্বাভাবিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবে, আণবিক আক্রমণ না চালানোর গ্যারান্টি দেবে। কিন্তু ঐ চুক্তির কালি শুকোবার আগেই আমেরিকা, একমাত্র জ্বালানি তেল সরবরাহ করা (তাও নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে) ছাড়া অন্য সকল প্রতিশ্রুতি থেকে পিছিয়ে

আটের পাতায় দেখুন

উত্তর কোরিয়ার নিন্দায় সিপিএম

গণতান্ত্রিক কোরিয়ার পরমাণু পরীক্ষাকে দুর্ভাগ্যজনক এবং নিন্দনীয় বলেই মনে করে সিপিআইএম। ... পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র 'পিপলস্ ডেমোক্র্যাসি' পত্রিকার আসন্ন সংখ্যার সম্পাদকীয়তেই গণতান্ত্রিক কোরিয়ায় পরমাণু বিস্ফোরণ সম্পর্কে পার্টির এই মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, গণতান্ত্রিক কোরিয়ার এই বিস্ফোরণ পূর্ব এশিয়ায় নতুন উত্তেজনা তৈরি করবে। ১৯৯৮-এ ভারত ও পাকিস্তান পরমাণু পরীক্ষা করার পর থেকে বিশ্বে পরমাণু পরীক্ষার নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘিত হয়নি। এ বার তা ভেঙে গেল। (গণশক্তি ঃ ১২ অক্টোবর, ২০০৬)

সিপিএম আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাও ত্যাগ করেছে! সিপিএম কর্মীরা ভেবে দেখুন, দল কোথায় চলেছে।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

সিপিএম আমাদের ঠকিয়েছে ঃ ক্ষোভে ফেটে পড়ল সিঙ্গুরের কৃষকরা

সিঙ্গুরে সরকারি হুমকি, পুলিশি সন্ত্রাস প্রভৃতি সত্ত্বেও বেশিরভাগ কৃষকই টাটার প্রস্তাবিত কারখানার জন্য জমি দিতে রাজি হয়নি। অল্পসংখ্যক কৃষক যাঁরা রাজি হয়েছেন তাঁদের বেশিরভাগকেই সিপিএম নেতারা টাটার কারখানায় কাজ দেওয়ার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বলেছিল, স্বেচ্ছায় জমি দিলে পরিবারের একজন সদস্যকে প্রশিক্ষণ দিয়ে চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। ফলে শিল্পোন্নয়ন নিগম যেদিন সিঙ্গুরে তাদের ক্যাম্প চালু করে সেদিন, জমি দিয়েছেন এমন বহু কৃষককেই কাজের আশায় লাইনে দাঁড়াতে দেখা যায়। কিন্তু তাঁদের স্বপ্ন ভাঙতে দেরি হয়নি। দপ্তরের কর্মীরা জানিয়ে দেন, এটি কোন নিয়োগপত্র দেওয়ার শিবির নয়, শুধুমাত্র কৃষিজীবী পরিবারের অল্পবয়সী পুরুষ সদস্যদেরই প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য নাম সংগ্রহ করা হচ্ছে। তাদের প্রচারপত্রেও সেই মর্মে লেখা আছে। শিল্পোন্নয়ন নিগমের এম ডি এম ভি রাও বলেছেন, ''এখানে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। চাকরি দেওয়ার দায়িত্ব নিগমের নয়। এলাকার মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা বিনা পয়সায় এখানে প্রশিক্ষণ পাবেন।'' সকলেই জানেন, সিপিএম নেতারা শিক্ষা নিয়ে যত বাগাড়ম্বরই করুন না কেন, গ্রামীণ গরিব কৃষক ও খেতমজুর পরিবারে মাধ্যমিক পাশের সংখ্যা আজও হাতে গোনা। তাহলে সেই পরিবারগুলির কী হবে? যে পরিবারে যুবক ছেলে নেই অথচ জমি দিয়েছে তাদের কী হবে? সে ভাবনাই উঠে এসেছে পঞ্চান্ন বছর বয়সী বিশ্বনাথ সাউয়ের কথায়। তিনি প্রথমে তাঁর চার বিঘা জমি টাটাকে দিতে রাজি হননি। এমনকী জমিরক্ষার আন্দোলনেও তিনি ছিলেন। কিন্তু সিপিএম নেতারা যখন তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আর্থিক অনুদান ছাড়াও টাটার কারখানায় একটি চাকরি তিনি পাবেন, তখনই তিনি জমি দিতে রাজি হন। এদিন সিপিএম নেতারা তাঁকে শিল্প উন্নয়ন নিগমের এই শিবিরে 'নিয়োগপত্র' নেওয়ার জন্য পাঠিয়েও দেন। লাইনে দাঁড়িয়ে যখন তিনি জানতে পারলেন যে এটি নিয়োগপত্র দেওয়ার শিবির নয় তখন তিনি রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ''সিপিএম নেতারা আমাকে প্রতারিত করেছে। সিপিএমের এই পরিকল্পনার কথা আগে বুঝতে পারলে আমি কিছুতেই জমি দিতাম না'' বললেন তিনি। এরকম অনেকেই এসেছিলেন সেদিন নিয়োগপত্রের আশায়। জ্যোতিপাড়ার শুকদেব বেরা, খাসেরভেড়ির আশুতোষ গুছাইত সহ অনেকেই সিপিএমের কথা শুনে ভেবেছিলেন এই ক্যাম্প থেকে টাটার কারখানায় চাকরির নিয়োগপত্র দেওয়া হবে। সকলেই একই উত্তর পেয়েছেন। সকলেই সিপিএমের বিরুদ্ধে তাঁদের ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন, প্রতারণার অভিযোগ করছেন। তবে এই প্রতারণা আস্তে আস্তে ধরা পড়ে যাচ্ছে। যাঁরা জমি দিয়েছেন এমন মানুষরাও আজ আবার ফিরে আসছেন জমি রক্ষার আন্দোলনে।

শান্তির নোবেল নিয়ে প্রশ্ন উঠল বাংলাদেশেই

[বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রবর্তক ডঃ ইউনুসের নোবেল শান্তি পদক পাওয়া নিয়ে ভারতের সংবাদমাধ্যমের একাংশ উল্লসিত, ইউনুস ও গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মাহাত্ম্য বর্ণনায় মুখর। তাঁর এই গ্রামীণ ব্যাঙ্ক নাকি দারিদ্র্য দূরীকরণে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করছে; অবশ্য এরাজ্যে সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার তাঁকে সংবর্ধনা দেবে — এই সংবাদেই গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাটির আসল চরিত্র অন্তত এরাজ্যের মানুষের ধরে ফেলা উচিত। যাই হোক, বাংলাদেশের চিন্তাশীল মানুষ ডঃ ইউনুসকে কী চোখে দেখেন, তার সামান্য পরিচয় পেতেই নিম্নের সংবাদটি দেওয়া হল। — সম্পাদক, গণদাবী।]

ঢাকা, ১৬ অক্টোবর — ''অধ্যাপক ডঃ মুহম্মদ ইউনুস দেশে কী এমন শান্তি এনেছেন যে তাঁকে শান্তির নোবেল দেওয়া হল?'' এ প্রশ্ন তুলেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক ও সাহিত্যিক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

... যুক্তরাজ্যভিত্তিক বাংলা অনলাইন প্রকাশনা ইউ কে বাঙালি-কে দেওয়া টেলিফোনে এক সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক চৌধুরী বলেন, ''যখন ন্যূনতম বেতনের দাবিতে গার্মেন্টস শ্রমিকরা আন্দোলন করে যাচ্ছে, দেশের স্বার্থবিরোধী চুক্তির প্রতিবাদে ফুলবাড়িতে মানুষ মরছে, জাতীয় সম্পদ রক্ষায় আন্দোলন আরও উত্তাল হচ্ছে — শান্তির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত এই মৌলিক প্রশ্নগুলিতে ডঃ ইউনুস কোনও কথা বলেন না।'' অসম্ভব চড়া সুদের হারসহ গ্রামীণ ব্যাঙ্কের অন্য দিকগুলির সমালোচনা করে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আরও বলেন, ''এর মাধ্যমে সমাজের নিচুতলায় পুঁজিবাদ বিকশিত হচ্ছে। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের গ্রাহক বাড়লেও দারিদ্র্য দূর হয়নি। গ্রাহকরা একটা চক্রে পড়ে গেছে, যার ফলে একের প্রতি অন্যের সহানুভূতিবোধও বিলুপ্ত হচ্ছে। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের হাত ধরে এ দেশে এসেছে গ্রামীণ ফোন — যারা প্রচুর টাকা দেশের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে।''

বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে ইউনুসের বিভিন্ন মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছেন বামধারার এই বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী। তিনি বলেন, ''তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদকাল ও নীতিনির্ধারণী ক্ষমতা বাড়ানোর যে প্রস্তাব ইউনুস করেছেন তা অত্যন্ত সন্দেহজনক। এমনও হতে পারে মুহম্মদ ইউনুসকে অনির্বাচিত এই সরকারের পদে বসানো হবে। এতে সামরিকবাহিনী ও আমলাতন্ত্রের সমর্থনও থাকবে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক চৌধুরী আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, ''নওয়াজ শরিফ ও বেনজিরের মতো খালেদা ও হাসিনাকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিলেও অবাক হওয়ার মতো কিছু নেই। ডঃ ইউনুস তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হলে মেয়াদ ও ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগে দেশের সম্পদ বিদেশে পাচারের জন্য প্রয়োজনীয় চুক্তিগুলো করে ফেলতে পারবেন।''

(দৈনিক স্টেটসম্যান ১৭-১০-০৬, বাসুদেব ধরের প্রতিবেদন)

শহীদ ভগৎ সিং জন্মশতবর্ষ পালন করুন

পাঁচের পাতার পর

বিপ্লবভীতির কারণেই ভগৎ সিংয়ের মতো বিপ্লবীদের নিরবচ্ছিন্ন আপসহীন সংগ্রামের ইতিহাসকে মুছে দিতে চেয়েছে। কিন্তু আজ যারা চায়, শোষিত নিপীড়িত মানুষের ব্যথাবেদনায় সিক্ত, ক্ষমতালোভ ও দুর্নীতির পাঁকে নিমজ্জিত এই সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে, তাদের এই মহান ব্রতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ বারবার বলেছেন, এ পথে এগোতে হলে অতীত দিনের মহান বিপ্লবীদের গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করতে হবে, তাঁদের জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর তা গ্রহণ করতে হবে। ভগৎ সিং সহ অবিস্মরণীয় বিপ্লবীরা রুচি-সংস্কৃতি-নৈতিকতার যে উচ্চতম মান সেযুগে নিজেদের চরিত্রে প্রতিফলিত করেছিলেন, তার মর্মবস্তুকে এযুগের বিপ্লবীদের আত্মস্থ করতে হবে, যাতে তার থেকেও উচ্চতর ও মহত্তর যে আদর্শ আজকের যুগে শোষণমুক্তির পথ দেখায়, সেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে তারা জীবনে গ্রহণ করার মতো উপযুক্ত চরিত্রের অধিকারী হতে পারে। এই বিপ্লবী আদর্শের ভিত্তিতে সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করার দ্বারাই কেবল আমরা যে ভগৎ সিংয়ের মতো বিপ্লবীদের প্রতি প্রকৃত মর্যাদা দেখাতে পারি একথাও কমরেড শিবদাস ঘোষই বলেছেন।

এই পরিস্থিতিতে এই মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যকে সামনে রেখে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিপ্লবী শহীদ-ই-আজম ভগৎ সিংয়ের জন্মশতবর্ষ পালন করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য দেশবাসীর কাছে আমি ঐকান্তিক আবেদন জানাচ্ছি। এর জন্য দেশের প্রতিটি প্রান্তে বর্ষব্যাপী সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণের ও তাকে কার্যকরী করার জন্য অনুরোধ করছি।

সংগ্রামী কৃষকদের প্রতি সংহতি জানাতে

৩ নভেম্বর সিঙ্গুর চলুন

জনসভা

বাজেমালিয়া হাসপাতাল মাঠ, বিকাল ২-৩০টা

বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ

জমায়েত ঃ কামারকুণ্ডু স্টেশন / বেলা ১-৩০মিঃ

উত্তর কোরিয়া

সাতের পাতার পর

যায়।

আমেরিকা উত্তর কোরিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানোর দাবি জানায় রাষ্ট্রসংঘে, তাকে 'সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র' বলে মার্কা দেয়, অনাক্রমণের গ্যারান্টি দিতে অস্বীকার করে এবং সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথে এক ইঞ্চিও অগ্রসর হয় না। লাইট ওয়াটার রিঅ্যাক্টর তৈরির কাজেও সে ঢিলে দিয়ে দেয় যাতে কমপক্ষে ২০১০ সালের আগে তার কাজ শেষ না হয়।

সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের ফলে গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়া নিদারুণ অর্থনৈতিক অসুবিধার মধ্যে পড়ে যায়। এই সংকট কাটাবার জন্য যেসব অর্থনৈতিক কর্মসূচি নেওয়া দরকার, সেখানেও বাধা পড়ে যুদ্ধের হুমকির জন্য। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, ১৯৯৮ সালে উত্তর ক্যারোলিনার সেমোর জনসন বিমান ঘাঁটি থেকে আমেরিকা নকল আণবিক বোমার সাহায্যে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ করার মহড়া দিয়েছিল।

উত্তর কোরিয়াকে
দানব প্রতিপন্ন করার কৌশল

উত্তর কোরিয়াকে একটি দানবীয় শক্তি বলে প্রচার করে, তার বিরুদ্ধে ক্রমাগত হুমকি দিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে আমেরিকা দ্বিমুখী স্বার্থ হাসিল করছে। এর দ্বারা একদিকে এই অঞ্চলে সামরিক উত্তেজনাকে চরম পর্যায়ে রেখে দিচ্ছে, অন্যদিকে এই অজুহাতেই এশিয়ায় সামরিক অস্ত্রসম্ভার উত্তরোত্তর বাড়িয়ে যাচ্ছে। বিশ্বশান্তি রক্ষার ধুয়া তুলেই জর্জ বুশ অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তির, অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও অস্ত্রব্যবসায়ীদের কাছে অত্যন্ত লাভজনক ক্ষেপনাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উমেদারি করেছেন।

মার্কিন কর্তারা মুখে যতই অস্বীকার করুন, মার্কিন শাসকশ্রেণী ও তার সামরিক বাহিনীর দীর্ঘদিনের নীতি ও লক্ষ্য হচ্ছে উত্তর কোরিয়ার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কিম ইল সুঙের নেতৃত্বে কোরিয়ার বিপ্লবের সময় থেকেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এই নীতি নিয়ে চলেছে। কোরিয়ার শ্রমিক-চাষীরা মালিক ও জমিদারদের উচ্ছেদ করে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে— এটাই ছিল গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়ার প্রথম 'অপরাধ'। কোরিয়ার যুদ্ধের ফলাফল ছিল দ্বিতীয় 'অপরাধ'। বিশাল সংখ্যায় মানুষের মৃত্যু ও ধ্বংস সত্ত্বেও উত্তরের বিপ্লবী সেনাবাহিনী, চীনের ভলান্টিয়ার বাহিনীর সহায়তায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করেছিল, যেজন্য সমগ্র কোরিয়ার দখল আমেরিকা নিতে পারেনি।

এজন্যই চীন ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সংহতিকে নষ্ট করাও আমেরিকার দীর্ঘকালের নীতি। এই অবস্থায় বর্তমান চীনের নেতৃত্বে যখন আমেরিকা ও জাপানের সাথে গলা মিলিয়ে উত্তর কোরিয়ার নিন্দা করে, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না মাওয়ের সমাজতান্ত্রিক চীন আজ শোধনবাদী নেতৃত্বের হাতে পড়ে কত নীচে নেমে গিয়েছে। চীনের বর্তমান ভূমিকাই আবার প্রমাণ করল যে, তা একটি নিকৃষ্ট পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে অধঃপতিত হয়েছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আসলে সমগ্র এশিয়াকে তার কবজায় আনতে চায়। এজন্যই উত্তর কোরিয়াকে সে টার্গেট করেছে। এ উদ্দেশ্যে মার্কিন-জাপান বিপজ্জনক সামরিক জোট গড়ে উঠেছে। জাপান ১৯১০ সালে কোরিয়াকে দখল করে উপনিবেশ হিসাবে ঐ দেশকে শাসন করেছে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত। সেই জাপান বর্তমান পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আবার নিজস্ব সামরিক শক্তি গড়ে তুলতে চাইছে, সেজন্য উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা চাপাবার সাম্রাজ্যবাদী কোরাসে জাপান উচ্চ কণ্ঠে যোগ দিয়েছে।

সর্বশেষে উত্তর কোরিয়া জানিয়ে দিয়েছে যে, আমেরিকা যদি উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ হুমকি বন্ধ করে, নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়, সম্পর্ক স্বাভাবিক করে, তবে আণবিক পরীক্ষ-নিরীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার পথে তারা যাবে না। ফলে সমগ্র ইতিহাস দেখাচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই দায়ী। ভবিষ্যত পরিস্থিতিও কী দাঁড়াবে সেটাও নির্ভর করবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ভূমিকার উপরই।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩২৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in